প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

আষাঢ় ১৩৫২

মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস, ৩০ কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা

১

কীর্তনের তাৎপর্য

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্‌বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চমালাং।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্ গীতকীর্ত্তিঃ ॥

—শ্রীমদ্‌ভাগবত, ১০ম

এ স্থলে শ্রীকৃষ্ণের বিপিনবিহারী বেশ বর্ণিত হইয়াছে: শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর দেহ, মস্তকে ময়ূরপুচ্ছের শিরোভূষণ, কর্ণে কর্ণিকার কুসুম, পরিধানে সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল পীতবাস, গলে আজানুলম্বিত পঞ্চবর্ণময়ী মালা, অধরে ন্যস্ত বেণু, গোপগণ চারিদিকে তাঁহার প্রশংসা গান করিতেছেন—এইভাবে তিনি তাঁহার লীলাভূমি রমণীয় বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন।

এখানে ব্রজবাসীরা শ্রীকৃষ্ণের যে বিচিত্র সৌন্দর্য-বৈদগ্ধ্যাদি প্রশংসারূপা গীতি গান করিলেন, তাহাই 'কীর্তন' শব্দের অর্থ। কৃৎ ধাতুর অর্থ প্রশংসা। সাধারণতঃ মৃত ব্যক্তির যে যশঃ তাহাই কীর্তি বলিয়া কথিত হয়, জীবিত ব্যক্তির সম্বন্ধে যশঃ খ্যাতি প্রভৃতি শব্দ প্রযোজ্য হয়। কিন্তু এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখেই তাঁহার যে যশোগাথা গীত হইল তাহাকেই ভাগবতকার বলিলেন 'কীর্তি'। কীর্তি এবং কীর্তন একই ধাতু হইতে উদ্‌ভূত হইয়াছে। কীর্তন বলিতে যে সংগীতবিশেষ বুঝায়, তাহা এই কীর্তি—বিশেষভাবে শ্রীকৃষ্ণের কীর্তি—গান করিবার পদ্ধতি হইতে আসিয়াছে। কীর্তন অর্থে সংগীত না বুঝাইয়া শুধু গুণানুবাদ বুঝাইতেও পারে। যেখানে নবধা ভক্তির লক্ষণ-বর্ণনায় কীর্তনের উল্লেখ আছে,

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

সেখানে গানই যে বুঝিতে হইবে, এমন নহে। কিন্তু ভগবদ্‌ভক্তির জন্য যে গুণকথন, লীলাবর্ণন প্রভৃতির প্রয়োজন, তাহা হইতেই সংগীতের নাম হইয়াছে 'কীর্তন'। সুতরাং ভগবদ্‌বিষয়ক সংগীত ব্যতীত অন্য সংগীতকে কীর্তন নামে অভিহিত করা যায় না। কীর্তন মুখ্যতঃ শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক সংগীত হইলেও বর্তমানকালে কালী-বিষয়ক সংগীতও কালীকীর্তন নামে পরিচিত হইতেছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, রামপ্রসাদের এবং তাঁহার প্রবর্তিত সুরে শ্যামা- বিষয়ক যে সকল গান লইয়া কালীকীর্তন গীত হয়, তাহাতে ভক্তিরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়।

'কীর্তন' বলিতে আমরা বাংলাদেশেরই একটি বিশিষ্ট সংগীত-পদ্ধতি বুঝি; কিন্তু 'কীর্তন' শব্দ বাংলাদেশেরই একচেটিয়া নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে মহারাষ্ট্রদেশে সাধক কবি তুকারাম যে সংগীত করিতেন তাহাও কীর্তন নামে কথিত হইয়াছে। তিনি তাঁহার একটি অভঙ্গে বলিয়াছেন যে, জাহ্নবীর ধারা যেমন ভগবানের পাদপদ্ম হইতে উত্থিত হইয়া মরধামে নামিয়াছে, কীর্তনের ধারা তেমনি মানুষের হৃদয় হইতে উৎসারিত হইয়া ভগবৎ-পাদপদ্মে গিয়া মিশিয়াছে। উভয় ধারাই পতিতপাবনা। মানুষের হৃদয় পবিত্র করিতে, পাপরাশি ধৌত করিতে কীর্তন গঙ্গারই মত ফলপ্রদ।

তবে বাংলার বাহিরে আমাদের কীর্তন-সংগীতের মত কোনও সংগীত নাই। ভগবৎ-সংগীত ভজন নামে অনেক স্থলে পরিচিত। কিন্তু কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বাংলার মাটিতে কীর্তন নামে যে এক অভিনব সংগীতপদ্ধতি জন্মলাভ করিয়াছিল, অন্য কোনও দেশে তাহার তুলনা পাওয়া যায় না।

এই নূতন পদ্ধতি অন্য অনেক ক্ষেত্রে অনুকৃত হইয়াছে। কীর্তনগানের সুকোমল আবেদন ও বৈশিষ্ট্য লইয়া বহু ব্রহ্মসংগীত রচিত হইয়াছে।

যাত্রা, থিয়েটার প্রভৃতিতেও কীর্তনের ভঙ্গী বহুল পরিমাণে গৃহীত হইয়াছে। বলা বাহুল্য এ সব স্থলে কীর্তনসংগীতের আভিজাত্য রক্ষিত না হইলেও, ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, তাহাতে কীর্তনের প্রভাব সুস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের সংগীত-প্রতিভা ছিল অনন্যসাধারণ। ভারতীয় সংগীতের মাধুর্য তিনি যেরূপ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, এরূপ খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটে। কীর্তনের বৈশিষ্ট্যও তিনি অন্তরঙ্গভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই তাঁহার রচিত কীর্তনগানগুলিতে সুরের কারুকলা যেরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তেমন আর কাহারও গানে হইয়াছে কিনা সন্দেহ। অবশ্য তিনি উচ্চাঙ্গের কীর্তনের সহিত সুপরিচিত হইলেও তাঁহার গানগুলিতে তিনি কীর্তনের আধুনিক সুরই যোজনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আমাদের দেশের আরও বহু কবি কীর্তনের ছাঁচে পদ রচনা করিয়াছেন এবং তাহাতে কীর্তনের অনুকরণে আখর দিবারও ব্যবস্থা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর উল্লেখ করিতে হয়। কবি এই পদাবলীতে বিদ্যাপতি ঠাকুর ও অন্য বৈষ্ণব-কবির অনুসরণে ব্রজবুলি-ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে বর্তমান কালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবির উপর কীর্তনের প্রভাব কতখানি পড়িয়াছিল।

২

নামসংকীর্তন

পূর্বেই বলিয়াছি কীর্তন বলিতে ভগবদ্‌বিষয়ক সংগীত বুঝায় এবং বিশেষভাবে শ্রীকৃষ্ণলীলা অবলম্বন করিয়া যে সংগীত তাহাকেই কীর্তন নামে অভিহিত করা হয়। প্রথমতঃ ইহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়: নামকীর্তন ও লীলাকীর্তন বা রসকীর্তন।

নামকীর্তনে ভগবানের নাম গীত হয়। সুরে ভগবানের নাম করিলেই তাহা নামকীর্তন-পদবাচ্য হয়। নববিধা ভক্তির প্রধান সাধন নামকীর্তন। 'নববিধা ভক্তি পূর্ণ হয় নাম হৈতে'। বৈষ্ণবদের মধ্যে এই নামকীর্তনের যেরূপ প্রভাব দেখা যায় অন্য কোনও ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে সেরূপ নহে। বৈষ্ণবেরা মনে করেন যে, 'কলিযুগে ধর্ম নামসংকীর্তন সার'। সংকীর্তন ও কীর্তন সমার্থক। উচ্চস্বরে হরিনাম করার নাম সংকীর্তন। নাম হইতেই প্রেম হয় এবং নাম করিতে করিতে ভক্ত কখনও কখনও বহির্জগতের সত্তা ভুলিয়া যান। ইহার নাম 'আবেশ'। যোগী যোগসাধনার দ্বারা যে সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হন, ভক্ত নামগানের দ্বারাও সেইরূপ ভাবসমাধি লাভ করিয়া থাকেন। এই জন্য বৈষ্ণবেরা উচ্চকণ্ঠে নামসংকীর্তনের প্রশংসা করিয়াছেন। নামের সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে :

কেহ বলে নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়।
কেহ বলে নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয়॥
হরিদাস কহে নামের এ দুই ফল নয়।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে মন উপজয়॥

—চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা ৩য় পরিচ্ছেদ,

ইহার নাম রতি বা প্রেম। নামসংকীর্তনের মুখ্য উদ্দেশ্য প্রেম, এবং হৃদয়ে এই প্রেম-সঞ্চারই বৈষ্ণবধর্মের প্রধান লক্ষ্য। বহু লোক একসঙ্গে নামসংকীর্তন করিতে পারেন। শ্রীচৈতন্যদেব যখন প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নামসংকীর্তন করিতেন, তখন সহস্র সহস্র লোক সেইসঙ্গে যোগদান করিতেন এইরূপ শুনা যায়।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, নামসংকীর্তনে সংগীতের ভাগ অল্প। কারণ কোনও একটি নাম বা নামসমূহ উচ্চকণ্ঠে অধিকক্ষণ গান করিলে তাহা

ক্রমেই একঘেয়ে হইয়া পড়ে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাহা হয় না। যাঁহারা চতুষ্প্রহর, অষ্ট প্রহর বা চব্বিশ প্রহর নামকীর্তন শুনিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে এই নামগান বিভিন্ন রাগরাগিণীতে এবং ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে বা তালে করা হয়। প্রভাতে ভৈরব, ভৈরবী, মধ্যাহ্নে বাগেশ্রী, সন্ধ্যায় পূরবী, ইমনকল্যাণ, রাত্রে বেহাগ এইরূপ পর্যায়ক্রমে নাম করা হয়। সুতরাং ভক্তগণের অবসাদ যাহাতে না আসিতে পারে, তাহার জন্য নামকীর্তনে যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয়। বহু খোল-করতাল একসঙ্গে বাজিতেছে, বেহালা বাঁশি প্রভৃতি অন্য যন্ত্রও হয়তো আছে, বিশুদ্ধ সুরে লয়ে নামের প্রবাহ চলিয়াছে, শ্রোতা ও গায়ক অশ্রুসমাকুল কণ্ঠে ভগবানকে আহ্বান করিতেছেন, কখনও দ্রুত কখনও বিলম্বিত লয়ে, কখনও কখনও সুর মুদারাগ্রাম অতিক্রম করিয়া তারায় ছুটিতেছে, আর গায়ক ও শ্রোতা পরস্পরের সত্তা ভুলিয়া উদ্দাম নৃত্য করিয়া পরিশেষে ভাবাবেশে ভূলুণ্ঠিত হইতেছেন— ইহাই নামসংকীর্তনের সাধারণ একটি দৃশ্য। মনে রাখিতে হইবে জনসংগীত বা mass singingএর দৃষ্টান্ত ভারতীয় সংগীতে এরূপ আর কোথাও দেখা যায় না। বিলাতের ধর্মমন্দিরে যে জনসংগীত শুনিতে পাওয়া যায় বা জাতীয় সংগীতে সর্বসাধারণের যোগদান করিবার যেরূপ সুযোগ আছে, নামসংকীর্তনে সেইরূপ ব্যাপক একতা দেখা যায়। নামসংকীর্তনে যে রাগরাগিণীর সমাবেশের কথা বলিলাম উহা অনেকটা বৈঠকী বা হিন্দুস্থানী রীতির অনুগত। সুতরাং সুরজ্ঞ গায়ক ইচ্ছা করিলে নামসংকীর্তনে যথেষ্ট নূতনত্ব ও মাধুর্য সঞ্চার করিতে পারেন।

একটি কথা এখানে বলা আবশ্যক। নামসংকীর্তনে যেমন ভগবানের নাম সুরসহযোগে গীত হয়, তেমনই সেই সঙ্গে প্রার্থনা ও দৈন্যনিবেদনও গীত হইতে পারে। এই সকল প্রার্থনাসংগীত বৈষ্ণব গীতিসাহিত্যের এক অপূর্ব সম্পদ। প্রার্থনাগীতে কীর্তনের লক্ষণ থাকে; সুরেরও ভাতি কীর্তনসংগীতের অনুগত।

শ্রীভগবন্নাম লইয়াই নামসংকীর্তন— যেমন, 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥' এই নামেরই পৌনঃপুনিক ও বিরামশূন্য আবৃত্তিতে অষ্ট প্রহর, চব্বিশ প্রহর অতিবাহিত হইতে পারে। অথবা শ্রীচৈতন্যের নামও তার সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে, যথা 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ।' 'নিতাই গৌর রাধে শ্যাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম।' শ্রীচৈতন্যও ভগবান বা ভগবানের অবতার বলিয়া পূজিত হন। শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ নামসংকীর্তন প্রচার করিয়া বঙ্গদেশে এক প্রবল ভাববন্যা আনয়ন করিয়াছিলেন। সেজন্য তাঁহাদিগকে সংকীর্তনের জনক বলা হয়:

প্রেমবন্যা নিতাই হৈতে অদ্বৈত তরঙ্গ তাতে
চৈতন্য বাতাসে উথলিল।

—বলরাম দাস।

এই প্রেমবন্যায় একদিন 'শান্তিপুর ডুবুডুবু নদে ভেসে যায়'। শ্রীচৈতন্যের অদ্ভুত প্রেরণা, নিত্যানন্দের অনবচ্ছিন্ন প্রচার এবং শান্তিপুরনাথ অদ্বৈতচন্দ্রের ভক্তিধর্ম-ব্যাখ্যা— এই তিনের সমাবেশে বাংলা জুড়িয়া এক বিরাট ধর্মের প্রবাহ বহিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের শিক্ষায় সর্বাপেক্ষা প্রধান কথা—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

কলিকালে নাম ভিন্ন জীবের অন্য গতি নাই, নাই, নাই। এই ত্রিসত্য করিবার উদ্দেশ্য এই যে ইহাতে সংশয়ের কোনও অবকাশ নাই।

সত্যযুগে লোকে ধ্যানে যে ফল লাভ করিত, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ করিলে যে পুণ্য হইত, দ্বাপরে পরিচর্যায় বা অর্চনায় যে সুকৃতি প্রাপ্ত হইত, কলিযুগে হরিকীর্তনে সেই ফল লভ্য হয়।

সত্যে যদ্ ধ্যায়তে বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতে মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ হরিকীর্তনাৎ॥

চৈতন্যচরিতামৃতে নামের ফল সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে,

> কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব।
> যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ॥
> কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ।
> যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥
> পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃত সিন্ধু।
> মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু ॥
> কৃষ্ণনামের ফল প্রেমা সর্ব শাস্ত্রে কয়।
>
> —চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, ৭ম পরি।

নামসংকীর্তনের উদ্দেশ্য এই প্রেমের উদয়। ভগবানের প্রতি মনের অনুকূলতা হইলে হৃদয়ে যে স্বার্থশূন্য বিমল ভাবের আবির্ভাব হয় তাহার নাম রতি। এই রতি গাঢ় হইলে তাহাকে বলে প্রেম। ইহা শুদ্ধসত্ত্ব স্বরূপ, নির্মল, কারণ ইহার মধ্যে কোনও স্বার্থের লেশ নাই। ভক্ত মোক্ষও কামনা করেন না। কারণ ভগবদ্‌ভজনে যদি মোক্ষের কামনা থাকে, তাহাও একপ্রকার স্বার্থপরতা।

বৈষ্ণবেরা যে কেন মোক্ষ বাঞ্ছা করেন না, তাহা একটু প্রণিধান করিলে বুঝিতে পারা যায়। তাঁহাদের মতে ভগবানই একমাত্র কাম্য। ভগবান নিজেই যেখানে কামনার বস্তু, সেখানে আর অন্য কি কাম্য থাকিতে পারে? অতএব নামসংকীর্তনের সার্থকতা হইতেছে চিত্তশুদ্ধিলাভ। সুরলয়-সহযোগে হউক বা এমনি হউক, নাম করিতে করিতে চিত্তের সমস্ত মলিনতা, বিষয়ের সমস্ত চিন্তা, স্বার্থের বা কামনার সকল প্রকার সন্ধান দূরীভূত হইয়া যায়। সুতরাং ভগবানের চিন্তা, তাঁহার নামগুণকীর্তন এবং ভগবৎ-সেবাই পরম বাঞ্ছিত। নামসংকীর্তন তাহারই সাধন। কারণ নাম ও নামী অভিন্ন

যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত ফিরেন আপনি শ্রীহরি॥
—চৈতন্যচরিতামৃত।

পদ্মপুরাণে আছে—

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান নামনামিনঃ॥

অর্থাৎ কৃষ্ণনাম চিন্তামণি (সর্বার্থপ্রদ); শুধু তাহাই নহে নাম সাক্ষাৎ চৈতন্য-রসমূর্তি শ্রীকৃষ্ণ যিনি পূর্ণব্রহ্ম, শুদ্ধবুদ্ধ এবং অপাপবিদ্ধ ও নিত্যমুক্ত। কারণ নাম ও নামীর কোনও ভেদ নাই।

৩

লীলাকীর্তন

কীর্তনের অপর বিভাগের নাম লীলাকীর্তন বা রসকীর্তন। শ্রীকৃষ্ণের লীলা অবলম্বন করিয়া যে সকল গীত, তাহা লীলাকীর্তন নামে অভিহিত হয়। কিন্তু বঙ্গদেশে যে লীলাকীর্তন প্রচলিত আছে, তাহা মাত্র কয়েকটি লীলা অবলম্বনেই রচিত। প্রথমতঃ সে-সমস্তই বৃন্দাবনলীলা-সম্পর্কে। বৃন্দাবনে যে-সকল লীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহারও সবগুলি কীর্তনে প্রচলিত নাই, যেমন পুতনাবধ, যমলার্জুনভঙ্গ ইত্যাদি। সচরাচর যে-সকল লীলা কীর্তনে শুনিতে পাওয়া যায় তাহা এই—

জন্মলীলা, নন্দোৎসব, বাল্যলীলা, গোষ্ঠলীলা, রাধাকুণ্ডমিলন, সূর্যপূজা, জলক্রীড়া, পাশাক্রীড়া, দানলীলা, সুবলমিলন, উত্তরগোষ্ঠ, নৃত্যরাস, মহারাস, বসন্তলীলা, বাসন্তী রাসলীলা, হোলিলীলা, হোলির নৃত্যরাস, ঝুলন, কুঞ্জভঙ্গ বা

নিশান্তলীলা, পূর্বরাগ, রূপানুরাগ, অভিসার, আক্ষেপানুরাগ, কলহান্তরিতা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, মান, বিরহ বা মাথুর, বংশীশিক্ষা ইত্যাদি।

যাত্রায় কালীয়দমন, কলঙ্কভঞ্জন, কংসবধ প্রভৃতি পালা আছে বটে, কিন্তু কীর্তনে ঐ সকল পালা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় না। কালীয়দমনের ও কলঙ্কভঞ্জনের পদাবলী আছে।

লীলাগান সম্বন্ধে কেহ কেহ মনে করেন যে, উহা অনধিকারীর পক্ষে নহে। অনধিকারী লীলাকীর্তন শুনিয়া উহার আধ্যাত্মিক দ্যোতনা বুঝিতে পারেন না; সুতরাং উহাতে তাঁহাদের ইষ্ট না হইয়া অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা বেশী। প্রেমদাসের বংশীশিক্ষায় আছে—

অন্তরঙ্গ সনে লীলারস-আস্বাদন
বহিরঙ্গ লৈয়া হরিনাম-সংকীর্তন ॥

ইহা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মত বলিয়া উদ্ধৃত হয়।

কিন্তু কে বহিরঙ্গ এবং কে অন্তরঙ্গ তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। অনেক সময়ে দেখিয়াছি যিনি অন্তরঙ্গ ও ভক্ত বলিয়া পরিচিত, তাঁহার মধ্যে রসের উপলব্ধি নাই, অথচ যাঁহাকে বহিরঙ্গ বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছি, তাঁহার মন লীলাগানে গলিয়া গিয়াছে। সে যাহা হউক, প্রশ্নটি শুধু সংগীতের দিক দিয়া বিচার্য নহে; অধিকারী-ভেদ এবং লীলা-তাৎপর্যের গূঢ় তত্ত্ব ইহার সহিত জড়িত। সে সকল জটিল আলোচনার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া বলা যাইতে পারে যে, যাঁহাদের নামসংকীর্তনে আনন্দ হয়, তাঁহাদের পক্ষে নামসংকীর্তনই শ্রেয়ঃ। আর যাঁহারা লীলাস্বাদনে আনন্দ পান, তাঁহারা লীলাগানের অধিকারী। ভগবানের নামে যদি প্রীতি হয়, তাহা হইলে তাঁহার গুণানুবাদে, লীলাস্মরণে, তৎপদাঙ্কিত তীর্থাদিতেও প্রীতি হওয়া স্বাভাবিক।

লীলাকীর্তনকে রসকীর্তন নামে অভিহিত করা হয়। রস অর্থে যাহা

আস্বাদন করা যায় অর্থাৎ যাহা চিন্তা করিলে বা শুনিলে হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হয়, তাহার নাম রস। আনন্দময় ভগবানের লীলাও আনন্দের সৃষ্টি করে, এই জন্যই লীলাকীর্তনের অপর নাম রসকীর্তন।

কীর্তনে ৬৪ রস আছে। প্রথমতঃ অলঙ্কারশাস্ত্রে শৃঙ্গাররস দুই ভাগে বিভক্ত হয়। যথা বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। অতিশয় অনুরক্ত যুবক-যুবতীর অসমাগমনিমিত্ত রতি যখন উৎকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয়, অভীষ্টসিদ্ধি করিতে পারে না, তখন সেই ভাবকে 'বিপ্রলম্ভ' বলে। প্রেমিক-প্রেমিকার পরস্পর মিলনে যে উল্লাসময় ভাব হৃদয়ে আবির্ভূত হয় তাহার নাম 'সম্ভোগ'। বিপ্রলম্ভ আবার চারি প্রকার, যথা—পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস। ইহাদের প্রত্যেকটি আবার আট ভাগে বিভক্ত। যথা— পূর্বরাগের অন্তর্গত আটটি রস— সাক্ষাৎ দর্শন, চিত্রপটে দর্শন, স্বপ্নে দর্শন, বন্দী বা ভাটমুখে গুণশ্রবণ, দূতীমুখে শ্রবণ, সখীমুখে শ্রবণ, গুণিজনের গানে শ্রবণ, বংশীধ্বনি শ্রবণ।

মানের অন্তর্গত আটটি রস— সখীমুখে শ্রবণ, শুকমুখে শ্রবণ, মুরলীধ্বনি শ্রবণ, প্রতিপক্ষের দেহে ভোগচিহ্ন দর্শন, প্রিয়তমের অঙ্গে ভোগচিহ্ন দর্শন, গোত্রস্খলন, স্বপ্নে দর্শন, অন্য নায়িকার সঙ্গ দর্শন।

প্রেমবৈচিত্ত্যের আটটি রস, যথা—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ, নিজপ্রতি আক্ষেপ, সখীর প্রতি, দূতীর প্রতি, মুরলীপ্রতি, বিধাতার প্রতি, কন্দর্পের প্রতি এবং গুরুজনের প্রতি আক্ষেপ।

প্রবাসের আটটি, যথা— ভাবী (বিরহ), মথুরাগমন, দ্বারকাগমন, কালীয়দমন (অদর্শনে বিরহ), গোচারণজনিত বিরহ, নন্দমোক্ষণ, কার্যানুরোধে প্রবাস, রাসে অন্তর্ধান।

বিপ্রলম্ভের ন্যায় সম্ভোগেরও চারিটি বিভাগ আছে, যথা— সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ, সংকীর্ণ সম্ভোগ, সম্পন্ন সম্ভোগ এবং সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ। সংক্ষিপ্ত সম্ভোগের অন্তর্গত আটটি রসের নাম— বাল্যাবস্থায় মিলন, গোষ্ঠে গমন, গোদোহন, অকস্মাৎ চুম্বন, হস্তাকর্ষণ, বস্ত্রাকর্ষণ, পথরোধ, রতিভোগ।

সংকীর্ণ সম্ভোগে মহারাস, জলক্রীড়া, কুঞ্জলীলা, দানলীলা, বংশীচুরি, নৌকাবিলাস, মধুপান, সূর্যপূজা এই আটটি বিভাগ আছে।

সম্পন্ন সম্ভোগের বিভাগ যথা— সুদূর দর্শন, ঝুলন, হোলি, প্রহেলিকা, পাশাখেলা, নর্তকরাস, রসালস, কপটনিদ্রা।

সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগে— স্বপ্নে বিলাস, কুরুক্ষেত্র, ভাবোল্লাস, ব্রজাগমন, বিপরীত সম্ভোগ, ভোজনকৌতুক, একত্র নিদ্রা, স্বাধীনভর্তৃকা।

পূর্বে যে সকল লীলার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এই চতুঃষষ্টি রসের অল্পাধিক বিস্তার আছে। কীর্তনগায়ককে সেইজন্য সাবধানতার সহিত গান করিতে হয়। কীর্তনিয়া শুধু সংগীতজ্ঞ হইলেই হয় না, তাঁহাকে পণ্ডিতও হইতে হয়। সকল কীর্তনিয়াই যে পণ্ডিত একথা বলিতেছি না। তবে পণ্ডিত হইলে ভাল হয়। পূর্বে এরূপ বহু কীর্তনগায়কের নাম শুনা যায় যাঁহারা পণ্ডিত ছিলেন। এই সেদিনও অদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজি, রায় বাহাদুর রসময় মিত্র কীর্তনগানে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। রস-জ্ঞান না থাকিলে অভিজ্ঞ শ্রোতার নিকট গায়ককে পদে পদে লাঞ্ছিত হইতে হয়। রস-জ্ঞানের অভাব থাকিলে রসাভাস হয় এবং রসাভাসবিশিষ্ট গানে রসিক শ্রোতার মনস্তুষ্টি হয় না। রসাভাসের অর্থ মোটামুটি রসদুষ্টি। অর্থাৎ যেখানে যে রসের পরিবেশন করিতে হইবে তাহা না করিয়া অন্য রস বা বিরুদ্ধ রস পরিবেশন করিলে তাহা শ্রুতিকটু হয়। সূক্ষ্ম রসবিচারে নিপুণতার সহিত সুরলয়ের সংগতি থাকিলে তবেই কীর্তন শ্রুতিসুখকর হয়। রসাভাসের সম্বন্ধে পরে বলিতেছি। এখানে শুধু বলা আবশ্যক যে, আনন্দ সকল সংগীতের উপাদান হইলেও, কীর্তনের বৈশিষ্ট্য এই যে, গায়ক এবং শ্রোতা উভয়কেই রসজ্ঞ হইতে হয় অর্থাৎ বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত এবং অলংকারশাস্ত্রের মূল সূত্রের সহিত সুপরিচয় থাকা আবশ্যক।

বর্তমান সময়ে যাঁহারা কীর্তনগান করেন, তাঁহারা সকলেই যে অলংকারশাস্ত্রে পারদর্শী, তাহা বলা যায় না। বরং তাঁহাদের অনেকেরই হয়তো তাদৃশ

শাস্ত্রজ্ঞান নাই। কিন্তু বংশপরম্পরা অথবা গুরুপরম্পরাক্রমে ইঁহারা কীর্তন শিক্ষা করিয়াছেন; তাহার ফলে অনেকটা সংস্কারবশতঃই ইঁহারা রসাভাসের হাত এড়াইয়া যান। অনেকেই হয়তো জানেন যে উচ্চাঙ্গের কীর্তনে মহাজন-রচিত পদাবলী গীত হইয়া থাকে। কীর্তনিয়া যদি এই পদাবলীর অর্থ না বুঝেন বা এক বুঝিতে আর বুঝেন, তবে তাঁহার কীর্তন ব্যর্থ হয়।

৪

কীর্তন ও পদাবলী

বৈষ্ণব পদাবলী শুধু কবিতা নহে, সংগীতও বটে। পদাবলীর বাঁধুনি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, এগুলি গানের জন্যই কল্পিত হইয়াছিল। এই খণ্ডকবিতাগুলি সুর ও তালে গঠিত হইলেই কীর্তন নামের যোগ্য হয়। বৈষ্ণব কবিরা অসামান্য অধ্যবসায়ের সহিত সহস্র সহস্র কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন; গায়কেরা তাহাই গান করিয়া বঙ্গদেশের অসংখ্য নরনারীর প্রাণে রসপ্রবাহ সৃষ্টি করিতেছেন। এইসকল মহাজন-পদাবলীর অনুকরণে বহু কবি—বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব—পদ রচনা করিয়াছেন। যেমন রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহের পদাবলী', শিশিরকুমার ঘোষের 'বলরাম দাসের পদাবলী'। কিন্তু প্রচলিত রসকীর্তনে সে-সকল সংগীত সুন্দর হইলেও গীত হয় না। অনেক আধুনিক পদ অবশ্য বহু গায়ক-গায়িকার মুখে শুনিতে পাওয়া যায় এবং সে-গুলিকে কীর্তনও বলা হয়, কিন্তু প্রাচীন পদ্ধতির কীর্তন-গায়কদিগের গানে ইহাদের কোনও স্থান নাই।

সুতরাং পদাবলী বলিতে বৈষ্ণব, ভক্ত, মহাজন-রচিত পদই বুঝিতে হইবে;

যথা জয়দেবের কোমলকান্ত পদাবলী, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলী, জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাসের পদ ইত্যাদি। প্রাচীন সংগ্রহগ্রন্থে এইসকল পদ সংকলিত হইয়া কীর্তনসমাজে গীত, আলোচিত, ও আস্বাদিত হইয়া আসিতেছে।

এইসকল পদাবলী বৈষ্ণবসাহিত্য হিসাবেও আলোচিত হয়। শুধু কবিত্বের দিক দিয়া বিচার করিলেও এই সকল কবিতাকে উচ্চাঙ্গের গীতি-কবিতারূপে গণ্য করিতে হয়। কিন্তু মনে রাখা আবশ্যক, গানের মধ্যেই ইহাদের চরম সার্থকতা। কীর্তনের সুরলহরী পর্দায় পর্দায় উঠিয়া ঐ সকল কবিতার অন্তর্নিহিত রসসম্পত্তিকে সজীব করিয়া তুলে, তখন গায়ক ও শ্রোতা উভয়েই সেই মাধুর্যতরঙ্গে আপনাদিগকে হারাইয়া ফেলেন। মহাজনদের সেই অপার্থিব সুধানিস্যন্দিত পদসৌন্দর্য লোকোত্তর জগতের আভাস বিকশিত করিয়া তোলে। ইহাই পদাবলীর গূঢ় ব্যঞ্জনা। কবিতার অতীত, ছন্দের অতীত, সুরের অতীত এমন এক ভাবজগতের সন্ধান কীর্তনে পাওয়া যায় যাহার জন্য শতশত বৎসর ইহা ভগবদ্‌ভক্তগণের পরম আস্বাদ্য হইয়া রহিয়াছে।

ভক্তগণ মনে করেন যে, কীর্তনগানে ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করা যায়। সেইজন্য পদাবলী শুধু সাহিত্য নহে, আধ্যাত্মিক ভাবসম্পদে সম্পন্নও বটে। অতএব পদাবলীকে তিন দিক দিয়া বিচার করিতে পারা যায় যায়—(১) সাহিত্যের দিক দিয়া ইহা গীতি-কবিতা (lyrics), (২) সংগীতের দিক দিয়া ইহা কীর্তন, (৩) আধ্যাত্মিক দিক দিয়া ইহা ভগবদ্‌ভজন। সুর-তান-লয়ের মধ্য দিয়া এই যে রাশি রাশি উৎকৃষ্ট ভগবৎসম্বন্ধীয় গীতিকবিতা রচিত হইয়াছে, ইহার তুলনা অন্য কোথায়ও পাওয়া যায় না।

ভগবৎ-বিষয়ক সংগীত বলিয়া সাহিত্যের প্রসিদ্ধ নবরসের উপরে আর পাঁচটি মুখ্য রস কথিত হইয়াছে। যথা— শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। ইহার মধ্যে শান্তরস স্থির ধীর অচঞ্চল, যোগিজনের আস্বাদ্য। রসিক

ভক্তগণ অপর চারি রসের মধ্য দিয়াই ভগবানকে আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করেন।

দাস্ত সখ্য বাৎসল্য শৃঙ্গার চারি রস।
চারি ভাবে ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ॥

—চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, ৩য় পরি।

পদাবলীতে এই চারি রসেরই প্রাচুর্য দেখা যায়। এইসকল রস অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন পালা কীর্তনে গীত হইয়া থাকে। শৃঙ্গার, উজ্জ্বল বা মধুর রসই সর্বশ্রেষ্ঠ। বৃন্দাবনলীলায় ব্রজবাসিগণ কেহ দাসভাবে, কেহ সখাভাবে, নন্দ-যশোদা প্রভৃতি বাৎসল্যভাবে এবং গোপীরা পতিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াছিলেন। কীর্তনে সেই সকল ভাবের পদাবলী গান করিয়া ভক্তের মনে দাস্ত সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের উদ্দীপন করা হইয়া থাকে। কৃষ্ণদর্শনে কৃষ্ণের সঙ্গলাভে ব্রজবাসিজনের যেরূপ বিবিধ চেষ্টা লক্ষিত হইত, ভক্তগণের হৃদয়ে কীর্তনগানে সেই সকল চেষ্টার আবির্ভাব হয়, ইহাই এই বিশেষ সংগীত-রীতির চরম সার্থকতা। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ প্রভৃতি সাত্ত্বিকভাব উদ্দীপন করাই কীর্তনের উদ্দেশ্য। অনেকেরই এই সাত্ত্বিক ভাবের সকলগুলি না হউক কতকগুলির যে উদ্রেক হয়, ইহা এখনও প্রত্যক্ষ করা যায়।

পদাবলীর জন্যই কীর্তন এবং কীর্তনের জন্যই পদাবলী। পূর্বেই বলা হইয়াছে উচ্চাঙ্গের কীর্তনে মহাজন-পদাবলী ব্যতীত অন্য কোনও গীতি গান করিবার নিয়ম নাই। জয়দেব চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব-কবিগণের পদাবলীই কীর্তনে ব্যবহৃত হয়। মহাজন-পদাবলীর সে সজীব স্রোত বহুদিন হইল রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, কীর্তনের ধারাও সুতরাং শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি কীর্তন-গায়কেরা এই পদাবলীকে তুলসীতলার প্রদীপের মত সযত্নে বক্ষের আড়াল দিয়া নানা ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যেও জীবিত রাখিয়াছেন।

৫

কীর্তনে গৌরচন্দ্রিকা

পদাবলী প্রধানতঃ রাধাকৃষ্ণের লীলা অবলম্বন করিয়াই রচিত। কিন্তু প্রেমের অবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন নদীয়ায় আবির্ভূত হইলেন তখন হইতে গৌরলীলা সম্বন্ধে পদাবলী রচিত হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণভজন পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল কিন্তু শ্রীচৈতন্য তাঁহার প্রেমধর্মে এই কৃষ্ণলীলার স্থান দিলেন সর্বোপরি। তাঁহার জীবনের ভাববিহ্বল আদর্শে বহু কবি অনুপ্রাণিত হইলেন এবং গৌরাঙ্গের লীলা অবলম্বনে পদ রচনা করিয়া বঙ্গের গীতিকবিতার ভাণ্ডার পূর্ণ করিলেন। গৌরাঙ্গ সম্বন্ধীয় পদগুলিকে বলে গৌরচন্দ্রিকা। কীর্তনে গৌরচন্দ্রিকা গান করিয়া তবে রাধাকৃষ্ণলীলা গান করিতে হয়। কৃষ্ণের অবতার বলিয়া গৌরচন্দ্রের প্রতি কৃষ্ণলীলার অনেকগুলি ভাবই সহজে আরোপিত হয়। তিনি যেভাবে লীলা আস্বাদন করিতেন, ভক্ত বৈষ্ণবেরা সেইভাবে লীলা আস্বাদন করিতে চেষ্টা করেন। ইহার একটি উদ্দেশ্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের গূঢ় রস-নিষ্ণাত লীলা আস্বাদন করিবার অধিকার সকলের নাই। বৈষ্ণব মনে করেন যে, মহাপ্রভুর চরিত্রের মধ্য দিয়াই কৃষ্ণলীলা আস্বাদন করিবার যোগ্যতা-লাভ হয়—

গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে নিত্যলীলা তারে স্ফুরে
সে জন ভজন অধিকারী।
—ঠাকুর নরোত্তমদাস।

বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্যের চরিত্র অতি নির্মল, অতি গভীর। সেইজন্য তাঁহার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই চৈতন্য-চরিত লিখিবার জন্য ভক্তগণের মধ্যে অপূর্ব উন্মাদনা দেখা দিল। তাহার ফলে চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যচন্দ্রোদয়, চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচিত হইল। এখনও শ্রীচৈতন্যের

নামে বৈষ্ণবদের মধ্যে যে ভাবপ্রবণতা দেখা যায় পৃথিবীর আর কোনও ধর্ম-সংস্কারক মহাপুরুষের নামে সেরূপ হয় কিনা সন্দেহ।

সুতরাং 'পদাবলী' বলিতে আমরা রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক ও গৌরাঙ্গ (এবং তাঁহার ভক্তগণ) সম্বন্ধে রচিত গানই বুঝিয়া থাকি।

৬

কীর্তনের ইতিহাস

বাংলার কীর্তনসংগীতের সম্পূর্ণ ইতিহাস পাওয়া যায় না। জয়দেবের সময় হইতে কীর্তনের প্রবাহ আসিয়াছে বলিয়া ধরা যায়। ঐ পদাবলী সম্বন্ধে আমাদের মনে এই প্রশ্ন আসে যে, জয়দেবের সময়ে তাঁহার কোমলকান্ত পদাবলীগুলি কি সুরে বা কি প্রণালীতে গীত হইত? জয়দেবের গীতগুলির ছন্দ আলোচনা করিলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, সে সময়ে সংগীতের রীতিমত চর্চা ছিল এবং সে সংগীতে ভাবসম্পদের বিকাশও যথেষ্ট ছিল। তাহা না হইলে ঐ প্রকারের গীতিকবিতা কখনও রচিত হইতে পারিত না। 'মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানং প্রিয়ে চারুশীলে', বা 'মাধবে মা কুরু মানিনি মানময়ে' প্রভৃতি পদের গতিভঙ্গী দেখিলেই বুঝা যায় যে, এই মধুর সংগীতে সুললিত সুর, কমনীয় ভাব ও ছন্দের বিচিত্র গতি— এই ত্রিধারা আসিয়া মিলিত হইয়াছিল। যাঁহারা বলেন যে প্রাচীন কালে গীত কথার অপেক্ষা রাখিত না, তাঁহারা এই বিষয়টি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। জয়দেবের পদাবলী যে সুরেই গীত হউক, তার মধ্যে যে কবিত্বের বিশেষ প্রাচুর্য ছিল একথা না বলিলেও চলে। সুতরাং কীর্তনের দুর্নিরীক্ষ্য অতীত ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এই কথাটিই আমাদের সর্বপ্রথমে মনে পড়ে যে, প্রথম হইতেই কীর্তনসংগীতে সুরের সঙ্গে কবিত্বের অপূর্ব সমাবেশ দেখা যায়।

প্রচলিত গীতগোবিন্দের পদে কতকগুলি সুর ও তালের সন্নিবেশ আছে। সেগুলি জয়দেবের সময় হইতেই চলিয়া আসিতেছে অথবা পরবর্তী কালের যোজনা তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে পূজারি গোস্বামীর টীকা দেখিলে মনে না হইয়া পারে না যে, তিনি ঐ সুর ও তাল জয়দেবের পদের অঙ্গ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, কারণ তিনি উহারও টীকা করিয়াছেন। দশাবতার স্তোত্রের শিরোদেশে 'মালবরাগেণ রূপকতালেন চ গীয়তে' এইরূপ নির্দেশ আছে। পূজারি গোস্বামী তাঁহার বালবোধিনী টীকায় লিখিতেছেন: 'গীতস্যাস্য মালবরাগ রূপকতাল ইত্যাহ মালবেতি। তস্য লক্ষণং যথা' ইত্যাদি। তিনি রূপক তালেরও লক্ষণ দিয়াছেন। এইরূপ গুর্জরী, রামকিরী, বসন্তরাগ এবং নিঃসার, একতালী এবং যতিতালেরও লক্ষণ ও সংজ্ঞা দিয়াছেন। এই সকল রাগরাগিণী ও তাল প্রাচীন সন্দেহ নাই। শার্ঙ্গদেবের সংগীতরত্নাকরে (এবং তাহারও পূর্বে) ইহাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে জানিতে কৌতূহল হয় যে, এইসকল গীত প্রাচীন গীতপদ্ধতি— যাহাকে বর্তমানে হিন্দুস্থানী সংগীতরীতি বলা হয়— অনুসারে গাওয়া হইত অথবা কোনও নূতন পদ্ধতি অবলম্বিত হইতে শুরু হইয়াছিল।

একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, জয়দেবের পদাবলী নূতন ধরনের গীত প্রবর্তন করিয়া এক নূতন যুগের উদ্‌বোধন করিল। গৌড়রাজসভার বাঙালী কবি তখনকার উচ্চ অভিজাত শ্রেণীর রুচি অনুসারে সংস্কৃত পদ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শ কি ছিল জানিবার সুবিধা নাই অর্থাৎ তিনি পূর্বতন কোনও সংগীত বা পদাবলী হইতে প্রেরণা পাইয়াছিলেন কিনা বলা যায় না। কিন্তু ইহা অনুমান করা অসংগত নহে যে, এই শ্রেণীর গীত সে সময়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল এবং তাহারই অনুসরণে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস (এবং হয়তো আরও অনেক কবি যাঁহাদের নাম কালের মণিমঞ্জুষায় রক্ষিত হয় নাই) তাঁহাদের অমর সংগীত রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের গীতিকবিতার ধরন দেখিলে মনে হয়— (১) লোকের সংগীতের পিপাসা

মিটাইবার উদ্দেশ্যেই এগুলি রচিত হইয়াছিল, (২) এইসময়ে বঙ্গে সম্ভবতঃ কোনও নূতনতর সংগীতের সৃষ্টি হইতেছিল, (৩) রাধাকৃষ্ণ-লীলার দিকে লোকের মন আকৃষ্ট হইতেছিল।

সম্ভবতঃ সে সময়ে প্রাচীন রাগরাগিণীর উপর পল্লীগানের সুরের তুলি বুলাইয়া এক মনোমুগ্ধকর সুরশিল্প আবিষ্কৃত হইতেছিল। সেই জন্যই হঠাৎ গীত-রচনার দিকে লোকের ঝোঁক পড়িয়া গেল। এই নূতনত্বের মোহ স্বীকার না করিলে পদাবলীর কল্লোলময় ধারার আবির্ভাব কোনও রূপে বুঝিতে পারা যায় না। মানুষ নূতন কিছুর আস্বাদ না পাইলে তাহাতে এমনভাবে উঠিয়া পড়িয়া লাগে না। সংস্কৃত বা বাংলা সাহিত্যে ইহার পূর্বে এরূপ গানরচনার প্রতি ঝোঁক দেখা যায় না।

ইহার পরই শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। শ্রীচৈতন্য যে ধর্ম প্রচার করিলেন তাহার একটি প্রধান বাহন হইল কীর্তন। অন্য অনেক ধর্মেও সংগীতের স্থান আছে; কিন্তু চৈতন্যের প্রেমধর্ম কীর্তনকে যেরূপ ভজনসাধনের অঙ্গ করিয়া তুলিল, এরূপ আর কোনও ধর্মে আছে কিনা সন্দেহ। চৈতন্যের ধর্ম-প্রচারে, বিশেষতঃ কীর্তনগানে, দেশ মাতিয়া উঠিল।

যত ছিল নাড়া বেনে সব হল কীর্ত্তুনে,
কাচি ভেঙে গড়ালে কর্তাল।

এইরূপ প্রবাদ হইতে এবং

শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়।

এই প্রকার উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ধর্মপ্রচারে কীর্তন কি বিপুল সহায়তা করিয়াছিল। এইজন্য বলা হয়, গৌর-নিতাই এই সংকীর্তনের জনয়িতা অর্থাৎ ইঁহারাই কীর্তনগানের প্রবর্তক। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, ইঁহাদের পূর্বে কি কীর্তনগান ছিল না? যদি থাকিত, তবে ইঁহাদিগকে সংকীর্তনের জনয়িতা বলিবার সার্থকতা কি?

বৃন্দাবনদাস স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন,

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সংকীর্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥

—চৈতন্যভাগবত।

'যাঁহাদের ভুজদ্বয় আজানুলম্বিত, কান্তি স্বর্ণের ন্যায় সুন্দর, চক্ষু কমলদলের ন্যায় আয়ত, সংকীর্তনের একমাত্র জনক, বিশ্বপালক, যুগধর্মরক্ষক জগতের প্রিয়কারী সেই নিত্যানন্দ ও চৈতন্যকে প্রণাম করি।'

পুরীতে চৈতন্যদেবের এই সংকীর্তন শুনিয়া মহারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র তাঁহার সভাপতিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'এ কি সংগীত?' পণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য বলিয়াছিলেন, 'ইহা চৈতন্যদেবেরই সৃষ্টি।'

চৈতন্যভাগবতে দেখা যায় যে, গয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্রীচৈতন্য যখন হরিনামে উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিলেন, তখন তাঁহার টোলের ছাত্রেরা বলিলেন, 'প্রভু আমরাও তোমার সঙ্গে কীর্তন করিব, কিন্তু কীর্তন কেমন করিয়া করিতে হয় তাহা তো জানি না। আমাদিগকে শিখাইয়া দেও।'

শিষ্যগণ বলেন কেমন সংকীর্তন।
আপনে শিখায় প্রভু শচীর নন্দন ॥
হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥
দিশা শিখায়েন প্রভু হাতে তালি দিয়া।
আপনি কীর্তন করে শিষ্যগণ লইয়া ॥

—চৈতন্যভাগবত।

এই হইতে নবদ্বীপে কীর্তন বা সংকীর্তনের আরম্ভ হইল। 'এবে সংকীর্তন হৈল নদীয়া নগরে।' কাজেই মনে হয় যে মহাপ্রভু হইতেই

সংকীর্তনের আরম্ভ। কিন্তু আবার অপর দিকে আমরা পাইতেছি যে, শ্রীচৈতন্যের জন্মতিথি দোলপূর্ণিমায় যখন চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল তখন দলে দলে লোক সংকীর্তন করিতে করিতে গঙ্গাস্নানে আসিয়াছিল এবং সেই সংকীর্তনের মধ্যেই জগন্নাথ মিশ্রের ভবনে এক গৌরবর্ণ শিশু আবির্ভূত হইলেন।

> সর্ব নবদ্বীপে দেখে হইল গ্রহণ।
> উঠিল মঙ্গলধ্বনি শ্রীহরিকীর্তন ॥
>
> ... ...
>
> গঙ্গাস্নানে চলিলেন সকল ভক্তগণ।
> নিরবধি চতুর্দিকে হরিসংকীর্তন ॥
>
> —চৈতন্যভাগবত।

কীর্তনে নৃত্য: শ্রীচৈতন্যের কিশোর বয়সের ইতিহাস অনুসরণ করিলে দেখা যায় যে তিনি কীর্তন করিতে ভালবাসিতেন, শ্রীবাসের অঙ্গনে প্রতি নিশায় কীর্তন হইত এবং সেই কীর্তনের সঙ্গে প্রভু নৃত্য করিতেন। নৃত্য যে কীর্তনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল, তাহা চৈতন্যজীবনী হইতে উপলব্ধ হয়। সুতরাং কীর্তনকে আমরা যখন হইতে বিশিষ্ট ধর্ম-সংগীত হিসাবে পাইতেছি, তখন হইতেই নৃত্য তাহার একটি প্রধান অংশরূপে পরিগণিত দেখি। নৃত্যের মহিমা সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে আছে—

‘কৃষ্ণভক্ত যখন নৃত্য করেন, তখন তাহার প্রভাবে বহুপ্রকার অমঙ্গল বিনষ্ট হয়। তাঁহার নৃত্যপর চরণযুগল ধরণীর, সঞ্চালিত নেত্রদ্বয়ের দৃষ্টি দিক্‌সমূহের এবং নৃত্যকালে উর্ধ্বোত্থিত বাহুদ্বয় সুরপুরের অমঙ্গল নাশ করে।’

নবদ্বীপের ভক্তগণ যখন দলে দলে আসিয়া প্রভুকে প্রণাম করিত, তখন তিনি তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন,

আপনে সভারে প্রভু করে উপদেশ।
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ বিশেষ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
—চৈতন্যভাগবত।

তিনি উপদেশ করিতেন,

কীর্তন করিহ সভে হাতে তালি দিয়া।
হরয়ে নমঃ কৃষ্ণযাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥
— চৈতন্যভাগবত।

এইভাবে ঘরে ঘরে নগরে নগরে সংকীর্তন প্রচারিত হইতে লাগিল। দুর্গোৎসবের জন্য প্রায় প্রতি ঘরে যে মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খঘণ্টা থাকিত, কীর্তনের সময় সেই সকল বাদ্য বাজিত।

মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ আছে সর্বঘরে।
দুর্গোৎসবকালে বাদ্য বাজাবার তরে॥
সেই সব বাদ্য এবে কীর্তনসময়ে।
গায়েন বায়েন সভে আনন্দ হৃদয়ে॥
—চৈতন্যভাগবত।

খোল ও মৃদঙ্গ: মৃদঙ্গ সুপরিচিত বাদ্যযন্ত্র। এখনও আমরা মৃদঙ্গ বলিতে পাখোয়াজ বুঝি— পাখোয়াজের অঙ্গ যদিও মৃন্ময় নহে। তাহার রহস্য এই যে মৃদঙ্গ যখন উদ্ভাবিত হয় তখন তাহার উপাদান ছিল মৃত্তিকা। ত্রিপুরাসুর শিবকর্তৃক নিহত হইলে তাহার শোণিতাক্ত মৃত্তিকার দ্বারা এই যন্ত্র নির্মিত হইয়াছিল এবং তাহারই চর্ম ও অন্ত্রদ্বারা ইহার আবরণ ও দল প্রস্তুত হইয়াছিল। পরে কোন সময়ে বোধ হয় মৃত্তিকার ভঙ্গপ্রবণতাহেতু কাষ্ঠের দ্বারা ইহার অঙ্গ গঠিত হইয়াছিল। যাহা হউক, এখন মৃদঙ্গ, মর্দল বা মাদল সাধারণতঃ কাষ্ঠনির্মিত চর্মযন্ত্র। সম্ভবতঃ শ্রীচৈতন্যের সময়ে মৃত্তিকা পুনরায়

ইহার উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইল। প্রবাদ এই যে, শ্রীচৈতন্য যেমন কীর্তনের জনক, তেমনই কীর্তনে খোলেরও প্রবর্তক। ভক্তিরত্নাকর বলেন,

> শ্রীপ্রভুর সম্পত্তি শ্রীখোল করতাল।
> তাহে কেহ অর্পয়ে চন্দন পুষ্পমাল॥
>
> —ভক্তিরত্নাকর, নবম তরঙ্গ।

অদ্যাপি কীর্তনের স্থলে শ্রীখোলে মাল্যচন্দন দিবার রীতি চলিয়া আসিতেছে। শ্রীচৈতন্যের 'সম্পত্তি' অর্থাৎ আবিষ্কার বলিয়াও বটে, ধর্ম-সংগীতে ব্যবহৃত হয় বলিয়াও বটে, খোল শব্দটির পূর্বে বৈষ্ণবেরা 'শ্রী' যোগ করিয়া থাকেন; কিন্তু ইহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ 'মৃদঙ্গে' শ্রী যোগের পদ্ধতি অপরিজ্ঞাত। মণিপুর রাজ্যে এখনও বৈষ্ণবধর্ম অনুসৃত হয়; সেখানে খোল-করতালের আরতি করিয়া কীর্তন আরম্ভ হয় দেখিয়াছি।

বৈষ্ণব পদাবলীতে 'রবাব' [১] 'বীণা' 'মুরজ' 'মুরলী' প্রভৃতি শব্দের বহুল ব্যবহার দেখা যায়; কিন্তু কীর্তনে এইসকল যন্ত্রের ব্যবহারদেখা যায় না। ইহাতে মনে হয় যে, কীর্তনে কেবল মানবকণ্ঠের স্বাভাবিক শক্তির উপরই নির্ভর করা হইত; খোল-করতাল ব্যতীত অন্য কোনও যন্ত্রের সহকারিতার অপেক্ষা করিত না। তাহার ফলে কীর্তন-সংগীত সর্বসাধারণের পক্ষে সুখলভ্য হইল। সে সময়ে খোল-করতাল দুর্মূল্য ছিল না, কাজেই দরিদ্র পল্লীতে পর্যন্ত কীর্তনের ব্যবস্থা করা কঠিন ছিল না।

---

[১] হিন্দুরা পূর্বে যে রুদ্রবীণা ব্যবহার করিতেন, মুসলমান আমলে তাহাই রবাব নামে পরিচিত হয়।

৭

খেতরীর মহোৎসব

কীর্তনের ইতিহাসে এই মহামহোৎসবের বৃত্তান্ত বিশেষ স্মরণীয়। গোপালপুরের জমিদার কৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্র নরোত্তম যৌবনে গৃহত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে পলায়ন করেন এবং সেখানে লোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া একজন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব বলিয়া গণ্য হন। এই বৈষ্ণব সন্ন্যাসী তাঁহার জন্মভূমি দর্শন করিতে আসিলে তাঁহার পিতৃব্যপুত্র সন্তোষ দত্তের অনুরোধে গ্রামপ্রান্তে কুটীর নির্মাণ করিয়া সেখানেই ভজন সাধনে জীবনাতিপাত করেন। তিনি সন্ন্যাসী হইয়াও স্বগ্রামে কেন বাস করিলেন, তাহা এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে :

পদ্মাবতী পার হৈয়া খেতরি যাইতে।
আইলা গ্রামবাসী লোক আগুসরি নিতে॥

… …

মনে উল্লাসে কেহ কহে কারু ঠাঁই।
এ অপূর্ব বৈরাগ্য উপমা দিতে নাই॥
কেহ কহে মোর মনে এই চিন্তা হয়।
নিজ রাজ্য বলি এথা রয় বা না রয়॥

… …

কেহ কহে হেথা পাষণ্ডির সীমা নাই।
নিজ রাজ্য হইলেও রহিব এই ঠাঁই॥
কেহ কহে এসকল দেশ উদ্ধারিতে।
হৈল আগমন সত্য বিচারিনু চিতে।

সে সময়ে উত্তরবঙ্গ বিলোপোন্মুখ বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্রস্থল ছিল। পাহাড়পুরে যে সোমপুর বিহারের ভগ্নাবশেষ বর্তমান রহিয়াছে তাহা দেখিলেই বুঝিতে

পারা যায় যে, বৌদ্ধধর্ম উত্তরবঙ্গে এক সময়ে প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম কালক্রমে নানা রহস্যপূর্ণ মতবাদে ও গুপ্ত ক্রিয়াকলাপে পরিণত হইয়া ধ্বংসের প্রতীক্ষা করিতেছিল। যাহারা বৌদ্ধধর্মের নামে নানা অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ প্রচার করিতেছিল, বৈষ্ণব-গ্রন্থে তাহারাই পাষণ্ডী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের জীবনে যেমন, নরোত্তমদাসের জীবনেও সেইরূপ, দুর্গত পতিত আশাহত নরনারীকে উদ্ধারের জন্য ব্যাকুলতা দেখা যায়। কীর্তন-প্রচারই হইল সেই উদ্ধারের উপায়। খেতরির মহোৎসবে কীর্তনের যে ধুম পড়িয়া গেল, তাহা সহস্র বাদানুবাদ অপেক্ষা কার্যকর হইয়াছিল। নীরস শুষ্ক কঠোর কর্মযোগ বা বৌদ্ধদের অষ্টাঙ্গমার্গ-সাধন অপেক্ষা হরিনাম গান করা সাধারণ লোকের পক্ষে অনেক সহজ ও আনন্দপ্রদ হইয়াছিল। আধ্যাত্মিক কল্যাণের প্রেরণার সঙ্গে সংগীতের আনন্দ মিশ্রিত হইয়া অনায়াসেই লোকমতের মোড় ফিরাইতে সক্ষম হইল।

কীর্তনের পদ্ধতি সম্বন্ধে খেতরির মহোৎসবে নরোত্তমদাস ঠাকুর যে পন্থা দেখাইলেন, তাহা অনেকটা অভিনব বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ অনিবদ্ধ ও নিবদ্ধ সংগীতের দ্বারা কীর্তনের আরম্ভ। গোকুলানন্দ অনিবদ্ধ গীতক্রম আলাপ করিলেন; অর্থাৎ শুধু 'বর্ণন্যাস স্বরালাপের' দ্বারা গীতের সূচনা হইল।

আলাপে গমক মন্দ্র মধ্য তার স্বরে
সে আলাপ শুনিতে কেবা বা ধৈর্য ধরে ॥

—ভক্তিরত্নাকর।

উদারা মুদারা তারা এই তিন স্বরগ্রাম অধিকার করিয়া গায়কের সুর নিম্ন হইতে উচ্চে উঠিতে লাগিল। সে আলাপচারিতে সকলেই মুগ্ধ হইল। গায়কগণ নরোত্তমদাস ঠাকুরের পরিবারভুক্ত ছিলেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতপ্রভু প্রভৃতিকে মনে মনে প্রণাম করিয়া গান ধরিলেন :

বার বার প্রণমিয়া সবার চরণে।
আলাপে অদ্‌ভুত রাগ প্রকট কারণে।
রাগিণী সহিত রাগ মূর্তিমন্ত কৈলা॥
শ্রুতি স্বর গ্রাম মূর্ছনাদি প্রকাশিলা॥
সুমধুর কণ্ঠধ্বনি ভেদয়ে গগন।
পরম মাদক সুধা নহে তার সম॥

—ভক্তিরত্নাকর।

ভক্তিরত্নাকরের এই প্রমাণ অনুসারে বলিতে হয় যে, এই কীর্তনের সঙ্গে খোল করতাল ব্যতীত অন্য কোনও বাদ্য যন্ত্র ব্যবহৃত হয় নাই। পরবর্তী কালেও দেখা যায় উচ্চাঙ্গের কীর্তনে অন্য কোনও যন্ত্রের সংগতি থাকে না। এখানে বাদ্যযন্ত্র-মধ্যে খোল ও করতাল ব্যতীত অন্য কোনও যন্ত্রের উল্লেখ নাই।

শ্রীপ্রভুর সম্পত্তি শ্রীখোল করতাল।
তাহে স্পর্শাইলা শ্রীচন্দন ফুলমাল॥

—ভক্তিরত্নাকর।

ইহার পর শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন ঠাকুর মহাশয় নরোত্তমদাস ঠাকুরকে মালা পরাইয়া দিলেন। অদ্যাপি কীর্তনে গায়কের কণ্ঠে মাল্যদান করিবার পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে। নরোত্তম অতঃপর নিবদ্ধ গীতের পরিপাটি প্রচার করিলেন। নিবদ্ধ গীত অর্থাৎ যাহাতে কথা ও সুরের মিলন আছে। সংগীত-শাস্ত্রে নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ সংগীতের এইরূপ নির্দেশ আছে :

অনিবদ্ধং নিবদ্ধঞ্চ দ্বিধা গীতমুদীরিতং।
আলপ্তির্বন্ধহীনঃ স্যাদ্রাগালাপনরূপিণী॥

—সংগীতরত্নাকর।

অর্থাৎ গীত 'অনিবদ্ধ' ও 'নিবদ্ধ' ভেদে দুই প্রকার। আলপ্তি বা আলাপে রাগের আলাপনমাত্র হয়, অর্থযুক্ত কথার দ্বারা ইহা আবদ্ধ নয়।

নিরর্থক হুংকার মাত্র, 'সা ঋ গ ম' বা আতানারি প্রভৃতির দ্বারা যে আলাপচারি হয়, তাহার নাম অনিবদ্ধ সংগীত। ইহা তালেরও অপেক্ষা রাখে না।

> বদ্ধং ধাতুভিরঙ্গৈশ্চ নিবদ্ধমভিধীয়তে।
>
> —সংগীতরত্নাকর।

ধাতু এবং অঙ্গের দ্বারা আলাপ সার্থক বা অর্থযুক্ত পদ হইলে তাহাকে নিবদ্ধ সংগীত বলা যায়। সংগীতসারে এই সংগীতের তিন প্রকার কথিত হইয়াছে : শুদ্ধ, শালগ ও সংকীর্ণ। শুদ্ধ সংগীতের নাম প্রবন্ধ। 'প্রকৃষ্টো যস্য বন্ধঃ স্যাৎ স প্রবন্ধো নিগদ্যতে।' এই প্রবন্ধসংগীতের চারটি ধাতু ও ছয়টি অঙ্গ থাকে। ধাতু অর্থে অবয়ব বা ভাগ, যথা—উদ্‌গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব, আভোগ। উদ্‌গ্রাহ অর্থাৎ গানের প্রথম পাদ বা কলি। উদ্‌গ্রাহের পরেই যে অংশ থাকে তাহাকে মেলাপক বলে। ধ্রুব বা ধ্রু-কলি মধ্যভাগে অবস্থিত এবং আভোগ থাকে শেষে—'আভোগশ্চান্তিমেঃ স্মৃতঃ'। ধ্রুব এবং আভোগের মধ্যে যে অংশ থাকে হরিনায়কের মতে তাহাকে 'অন্তরা' কহে। আভোগাংশে কবি এবং নায়কের নাম থাকে। সঙ্গীতশাস্ত্রের এই নিয়মানুসারেই অধিকাংশ বৈষ্ণব-পদাবলী রচিত হইয়াছে।

কীর্তন-পদাবলীতে প্রায় সকল পদেরই শেষে 'ভণিতা' আছে। 'ভণিতা' বা 'ভণিতি' অর্থে 'উক্তি'। পদ যাঁহার রচিত সেই কবির নাম দিবার পদ্ধতি সংগীতশাস্ত্রের এই সংজ্ঞা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। সংগীতশাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারেই 'আভোগ' নামক গীতাংশে কবি বা নায়কের নাম অথবা উভয়ের নাম থাকে। বিদ্যাপতির অনেক পদে তাঁহার নিজের নাম, কোনও কোনও পদে নিজের নামের সঙ্গে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক (নায়ক) শিবসিংহের এবং কোনও পদে শিবসিংহের মাতা ও পত্নীর নাম সংযুক্ত আছে।

প্রবন্ধ গীতের পাঁচটি জাতি আছে :

> প্রবন্ধজাতয়ঃ পঞ্চ বর্তন্তে তাঃ ক্রমেণ চ।
> ষড়্‌ভিরঙ্গৈর্মেদিনী স্যান্নন্দিনী পঞ্চভির্ভবেৎ ॥
> চতুর্ভি দীপনী প্রোক্তা ত্রিভিরঙ্গৈস্তু পাবনী।
> দ্বাভ্যাং তারাবলী জাতিরঙ্গাভ্যামুপজায়তে ॥
>
> —সংগীতপারিজাত।

অর্থাৎ ষড়ঙ্গযুক্ত প্রবন্ধ মেদিনী জাতীয়, পঞ্চাঙ্গযুক্ত নন্দিনী, চতুরঙ্গযুক্ত দীপনী, অঙ্গত্রয়ে পাবনী এবং অঙ্গদ্বয়ে তারাবলী জাতীয় হয়। বস্তুতঃ প্রবন্ধ গীতের জাতি বা প্রকার ভেদ অসংখ্য :

> ভেদঃ শুদ্ধপ্রবন্ধানামানন্ত্যাদেক এব হি।

সুকবি প্রবন্ধকে যথেচ্ছভাবে সাজাইতে পারেন। এই প্রবন্ধ-গীতই নিবদ্ধ সংগীত এবং ইহাই কীর্তনগানে অনুসৃত হইয়া আসিতেছে।

নরোত্তম এই নিবদ্ধ গীতই করিয়াছিলেন। প্রথমে যে অনিবদ্ধ গীত বা আলাপচারীর দ্বারা গীত আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার ধারা কিছুটা এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। কীর্তনগানের পূর্বে গায়কেরা এখনও অর্থশূন্য বর্ণন্যাসের দ্বারা আলাপ করিয়া থাকেন। কিন্তু অনেক স্থলে উহা কেবল পরস্পরের কণ্ঠমিলনব্যাপারে পরিণত হয়। এইজন্য এই আলাপচারির নাম হইয়াছে 'মেল' বা 'মেল জমাট'। অর্থাৎ সুরের 'জমাট' করিয়া গান ধরা হয়। কীর্তনিয়াদিগের অজ্ঞতার জন্যই হউক, বা অন্য কোনও কারণেই হউক, রাগরাগিণীর আলাপ এক্ষণে বড় একটা শুনা যায় না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে হয়তো প্রথমে যে গানটি করা হইবে, তাহারই কিছু আভাস মেলজমাটে দেখা যায়, কিন্তু তাহাকে প্রকৃত 'আলাপ' বলা চলে না।

গৌরচন্দ্রিকার তাৎপর্য : খেতরির মহোৎসবের আর-একটি বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, গৌরচন্দ্রিকা গান করিয়া কীর্তন আরম্ভ করা হইয়াছিল। 'শ্রীরাধিকাভাবে মগ্ন নদীয়ার চান্দ' —এইভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের গুণগান করিয়া কৃষ্ণরাধিকার লীলা গায়িবার পদ্ধতি সম্ভবতঃ ইহার পূর্বে আবিষ্কৃত হয় নাই।

> গৌরগুণ-গীতারম্ভে অধৈর্য সকলে।
>
> —ভক্তিরত্নাকর

ইহা হইতে মনে হয়, নরোত্তমদাস ঠাকুরই এই গৌরচন্দ্রিকা গাহিবার প্রথা প্রবর্তন করিলেন। এই সময় হইতেই কীর্তন করিবার পূর্বে মহাপ্রভুকে আকর্ষণ করিবার রীতি অবলম্বিত হয়। গৌরচন্দ্রিকা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে কীর্তনে আকর্ষণ করিবার মন্ত্রস্বরূপ। যে লীলাগান করিতে হইবে, 'তদুচিত' একটি গৌরচন্দ্রিকা বা সংক্ষেপে 'গৌরচন্দ্র' গান করিবার রীতি উচ্চাঙ্গের কীর্তনে এখনও বর্তমান। এজন্য পদাবলী-সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদ যেরূপ অসংখ্য, গৌরাঙ্গবিষয়ক পদও সেইরূপ বহু। কীর্তনের প্রয়োজনেই গৌরচন্দ্রিকার পদ রচিত হইয়াছে। প্রণালীবদ্ধ কীর্তনে গৌরচন্দ্রিকা গীত না হইলে রাধাকৃষ্ণলীলা গান করিবার নিয়ম নাই। গৌরচন্দ্রকে স্মরণ না করিয়া লীলাগান করিলে অভিজ্ঞ শ্রোতা সে গান শ্রবণ করেন না।

বৈষ্ণবেরা মনে করেন, রাধাকৃষ্ণলীলা গাহিবার ও শুনিবার অধিকারী হইতে হইলে পূর্বে গৌরচন্দ্রকে স্মরণ করিতে হয়। মহাপ্রভু নীলাচলে স্বরূপদামোদর পণ্ডিতের মুখে লীলাগান শুনিয়া আনন্দ পাইতেন। মহাপ্রভু নিজে এবং স্বরূপ উভয়েই সন্ন্যাসী ; সংসারে আসক্তি-শূন্য। জীবনের সমস্ত কামনা বাসনা জয় করিয়া তাঁহারা একান্তভাবে ভগবানের পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। কীর্তনগায়ক ও শ্রোতা কেহই সে উচ্চাধিকার লাভ করেন নাই। কাজেই মহাপ্রভুকে স্মরণ করিয়া

তাঁহাকে কীর্তনের আসরে আহ্বান করিয়া, তাঁহার নির্মল চরিত্র ধ্যান করিয়া রাধাকৃষ্ণলীলা গান করিলে তবেই সে বিষয়ে যোগ্যতা জন্মে। এই কারণেই হউক অথবা যাঁহার কৃপায় রাধাকৃষ্ণের যুগলোপাসনা জগতে প্রচারিত হইয়াছে তাঁহার পবিত্র নামে স্মৃতিচন্দন অর্পণ করিবার মানসেই হউক, গৌরচন্দ্রিকা না গাহিয়া কীর্তন গান করা হয় না।

কীর্তনে গীত, বাদ্য ও নৃত্যের সমন্বয় : আরও একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়, খেতরির মহোৎসবে যে কীর্তন হইল, নৃত্য তাহার একটি প্রধান অঙ্গ ছিল।

> চতুর্দিকে অসংখ্য লোকের নাহি অন্ত।
> নাচে মহারঙ্গে সে সকল ভাগ্যবন্ত॥
>
> —ভক্তিরত্নাকর।

নৃত্য, গীত ও বাদ্য এই তিন লইয়াই সংগীত, এই জন্য ইহাকে 'তৌর্যত্রিক' বলা হয়। অন্য অনেক প্রকার ভারতীয় সংগীতে গীত ও বাদ্যের সমন্বয় দেখা যায়; কখনও কখনও নৃত্য ও বাদ্যের। কিন্তু কীর্তনগানে এই তিনের যেরূপ সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অন্যত্র সুলভ নহে। মহাপ্রভুর জীবনচরিতেও দেখা যায় যে তিনি পরম আবেশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কীর্তনে নৃত্য করিতেছেন। শ্রীবাসের অঙ্গনে এই কীর্তন নৃত্যবিলাসে সমৃদ্ধ হইত। এখন কিন্তু নৃত্য কীর্তনের সেরূপ অপরিহার্য অংশ নহে। নাম সংকীর্তনে কখনও কখনও নৃত্যের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় বটে। কিন্তু উচ্চাঙ্গের লীলাকীর্তনে প্রায়ই নৃত্যের সমাবেশ থাকে না। কীর্তনের মূলগায়ক কখনও কখনও গানের সঙ্গে, বাদ্যের ছন্দে নৃত্যের আভাস প্রকাশ করিলেও অন্য গায়কেরা এবং শ্রোতারা সে নৃত্যে যোগদান করিতেছেন এরূপ প্রায়ই দেখা যায় না।

কোনও কোনও কীর্তনগায়ক গৌরচন্দ্রিকা গান করিবার সময় দলসহ দণ্ডায়মান হইয়া কীর্তন করেন ও গৌরচন্দ্রিকা নির্বাহ করিয়া উপবেশন করেন এবং পরবর্তী অংশ বসিয়াই পরিসমাপ্ত করেন। শ্রোতার সুবিধার

জন্য গায়ককে কখনও কখনও দাঁড়াইতেও দেখা যায় এবং তাঁহার তখনকার অঙ্গভঙ্গী কখনও কখনও নৃত্যেরই অনুরূপ হওয়া বিচিত্র নহে। খেতরির মহোৎসবে সম্ভবতঃ নরোত্তমদাস দণ্ডায়মান হইয়া কীর্তন করিয়াছিলেন এবং তদবস্থায় নৃত্যের সুযোগও যথেষ্ট ঘটিয়াছিল। যে কীর্তনে গায়ক এবং শ্রোতা নৃত্যের আবেশে মাতিয়া উঠেন তাহাকে 'উদ্দণ্ড কীর্তন' বলে।

৮

কীর্তনের শ্রেণীবিভাগ

নরোত্তম কীর্তনের যে পন্থা দেখাইলেন, তাহার নাম হইল 'গরানহাটী' কীর্তন। খেতরি যে পরগনায় অবস্থিত, সেই পরগনার নাম সম্ভবতঃ 'গড়ের হাট' ছিল। এখন তাহার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। এই গড়ের হাট হইতে গড়েরহাটী গড়ানহাটী বা গরানহাটী নাম হইয়া থাকিবে। এইরূপ মনোহরসাহী পরগনা (বর্ধমান জেলা) হইতে মনোহরসাহী নামে কীর্তনের সুর হইয়াছে। রানীহাটী (বর্ধমান জেলায়) হইতে রেনেটি এবং মান্দারন (মেদিনীপুর) হইতে মন্দারিনী বা মান্দারিনী সুরের সৃষ্টি হইয়াছে। মনোহরসাহী অপেক্ষা রেনেটি ও মন্দারিনী সুর সরল ও সুলভ। সুরের কারুকার্য মনোহরসাহী কীর্তনে যেরূপ আছে, সেরূপ অন্য কোনও সুরে নাই। কথিত আছে শ্রীনিবাস আচার্য মনোহরসাহী ও রেনেটি সুরের সৃষ্টিকর্তা। জ্ঞানদাস, বলরামদাস প্রমুখ পদকর্তার প্রভাবে মনোহরসাহী কীর্তন-গান এক সময়ে অত্যন্ত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। ইঁহারা নরোত্তমদাসের সমসাময়িক। রেনেটি গাত টেঁয়া বৈদ্যপুরে বৈষ্ণবদাস (গোকুলানন্দ সেন) ও তাঁহার বন্ধু উদ্ধবদাস (কৃষ্ণকান্ত মজুমদার) প্রভৃতির দ্বারা সুসমৃদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।

কীর্তনের এই শ্রেণীবিভাগ সুরের প্রণালী অথবা বৈচিত্র্য অনুসারে হইয়াছিল। কীর্তনের বৈশিষ্ট্যগুলি ইহাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই অল্পবিস্তর বর্তমান ছিল যথা শ্রুতি ও গমকের প্রাধান্য, রাগরাগিণীর বিশিষ্ট ভঙ্গী, ছন্দের নূতনত্ব (দশকুশী, ডাঁসপাহিড়া, তেওট ইত্যাদি) এবং আখরের যোজনা ইত্যাদি।

উল্লিখিত চারিটি ঠাট ছাড়া আরও একটি ঠাটের উল্লেখ কখনও কখনও দেখা যায়; উহার নাম ঝাড়খণ্ডী। ঝাড়খণ্ড বর্তমান মেদিনীপুর জেলার একটি অংশ বটে। কিন্তু এই ঠাটের কীর্তন সুপ্রচলিত নহে।

সরলতা ও গাম্ভীর্যে গরানহাটী কীর্তন ধ্রুপদের সহিত তুলনীয়। মনোহরসাহীর স্বরবৈচিত্র্য খেয়ালের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কলাচাতুর্যে ও মাধুর্যে কীর্তনমাত্রই ঠুংরি গানের সহিত তুলনীয় হইতে পারে।

কীর্তনের প্রসারের যুগে এইসকল সুরের প্রত্যেকেরই আভিজাত্য ও স্বাতন্ত্র্য ছিল। বর্তমানে এইসকল সুরের নিজস্ব গায়ক বিরল। ফলে ‘গরানহাটী’-গায়ক ‘মনোহরসাহী’র কারুকার্য দ্বারা গান সাজাইয়া থাকেন। মনোহরসাহী-গায়কও রেনেটি বা মন্দারিনী সুরের ভাঁজ আমদানি করিতে দ্বিধাবোধ করেন না। ফলে হইয়াছে এই যে, এইসকল সুরের স্বাতন্ত্র্য ঠিক ধরিতে পারা যায় না। গায়কের অভাবেই এইরূপ ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। রাঢ় অঞ্চলে ‘কীর্তন’ বলিতে সাধারণতঃ ‘মনোহরসাহী’ কীর্তন বুঝাইয়া থাকে।

৯

কীর্তনের অবনতি

যতদূর জানা যায় তাহাতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত কীর্তনের যথেষ্ট উন্নতি ছিল। তাহার পর ‘কবি’ ও পাঁচালির প্রাদুর্ভাবে কীর্তনের

জনপ্রিয়তার হ্রাস হইতে থাকে। উৎসাহ ব্যতীত, উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকের অভাবে, কোনও ললিতকলাই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। ইংরেজ-বিজয়ের পরে দেশে যে পরিস্থিতির উদ্‌ভব হইল, তাহাতে বঙ্গদেশের বিশিষ্ট সম্পদ এই কীর্তনগানের সমাদর কমিতে আরম্ভ হইল। রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃতসমুদ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে সংকলিত হয় এবং ইহার কিছু পরেই বৈষ্ণবদাস তাঁহার সুবিখ্যাত ও সুবৃহৎ পদকল্পতরু সংকলন করেন। ইহার পরেও কীর্তনের প্রভাব কতকদিন চলিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। সম্ভবতঃ উনবিংশ শতাব্দী হইতেই কীর্তনের অবনতি ঘটিতে লাগিল। এইসময় হইতে বাংলাদেশে 'কবির গানে'র ধুম পড়িয়া যায়। কবির গানে দুই দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইত এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর দ্বারা জয় পরাজয় নির্ণীত হইত। রাধাকৃষ্ণের লীলা অবলম্বন করিয়া গান বাঁধিয়া কবিওয়ালারা 'পাল্লা' দিতেন এবং তাহা সাধারণ জনগণ জাতিধর্মনির্বিশেষে উপভোগ করিত। এই সময়ে যাত্রা ও পাঁচালিরও প্রসার ঘটে। এই সকল সংগীত বা তথাকথিত সংগীতের প্রতি জনসাধারণের পক্ষপাত যেমন বাড়িতে লাগিল, তেমনি কীর্তনের আভিজাত্য খর্ব হইয়া গেল।

ঢপকীর্তন: তবে কীর্তন 'ভাঙিয়া' ঢপের সৃষ্টি হইল। 'ঢপ' শব্দের ব্যুৎপত্তি জানা যায় না। মধুসূদন কান নামক একজন গায়ক ইহার স্রষ্টা না হইলেও যথেষ্ট পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন। মধুকান বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে যশোর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং নিজ প্রতিভাগুণে বাংলার প্রায় সর্বত্র সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। মধুকান নিজ পরিবারস্থ স্ত্রীপুরুষগণ লইয়া গান করিতেন এবং নানা রাগরাগিণী সমন্বিত গীতের দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করিতেন। রাধাকৃষ্ণের লীলা অবলম্বন করিয়া মধুসূদন বহু পদ রচনা করিয়াছিলেন এবং কীর্তন-পদাবলীর অনুকরণে প্রত্যেক পদের শেষে নিজের নামের ভণিতা যোগ করিতেন। সমগ্র নাম না দিয়া তিনি অনেক সময়ে 'সূদন' ভণিতা দিতেই ভালবাসিতেন। ইহা লইয়া একজন মধুকানকে একটু ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়া-

ছিলেন, 'মধু, তুমি সূদন ভণিতা দাও কেন ?' ইহার উত্তরে মধু বিনয় করিয়া বলিয়াছিলেন, 'নামে মধু থাকিলেই কি আর না থাকিলেই কি ? গানে মধু থাকিলেই হইল।' এইগল্পের অন্য সংস্করণে আছে, মধু বলিলেন, 'আপনারা মধু যোগ করিয়া লইবেন।' যাহা হউক, মধুসূদনের ঢপকীর্তন একসময়ে খুব খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। ঢপে বৈঠকী রাগরাগিণী যথাযথভাবে অনুসৃত হইত। সুরের বিশিষ্ট ভঙ্গীতেই ইহার বৈশিষ্ট্য ছিল। রামপ্রসাদেরও যেমন একটি বিশিষ্ট সুরের ভঙ্গী ছিল যাহার জন্য রামপ্রসাদী গান বৈঠকী রীতি অনুসরণ করিলেও স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে, মধুকানের ঢপ সুরও তেমনি একটি বিশিষ্ট সুর। ইহাতে কীর্তনেরও ছায়া বেশ সুপরিস্ফুট থাকিত। গানের মাঝে মাঝে সুরে কথা কহিবার রীতি ছিল, যেমন 'কৃষ্ণ কহিতেছেন' 'শ্রীমতী কহিতেছেন' ইত্যাদি।

আধুনিক কালে এক শ্রেণীর কীর্তন শুনিতে পাওয়া যায়, যাহা সাধারণতঃ 'ঢপকীর্তন' নামে অভিহিত হয়। কিছুদিন পূর্বেও এই ঢপকীর্তন গায়িকাদের মুখেই সচরাচর শুনা যাইত। গত কয়েক বৎসর দেখিতেছি এই কীর্তনওয়ালীদের আর তেমন পসার নাই। বাংলাদেশের স্থানে স্থানে বিশেষতঃ কলিকাতা শহরে কীর্তন শ্রাদ্ধের একটি অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়। অর্থাৎ হিন্দুদের আদ্যশ্রাদ্ধ-বাসরে নিমন্ত্রিতদের জন্য সভা হয় এবং এই সভায় কীর্তনের ব্যবস্থা থাকে। ইহাকে বলে সভারোহণ। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অধ্যাপকদের সমাগম ও কীর্তনগান এই সভারোহণের বিশিষ্ট অঙ্গ। নিমন্ত্রিতেরা এই শ্রাদ্ধসভায় যোগদান করেন। এইরূপ বহুসভায় কীর্তনওয়ালীদের গান শুনিতে পাওয়া যাইত। বিগত পঁচিশ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এই শ্রেণীর গায়িকাদের প্রভাব অনেক কমিয়া গিয়াছে। প্রথাটি ঠিকই আছে, তবে মেয়েদের স্থলে পুরুষদেরই কীর্তনের চলন হইয়াছে। কীর্তনগায়িকাদের মধ্যে পান্নাময়ী এক সময়ে খুব নাম করিয়াছিলেন। এখনও গ্রামোফোনে তাঁর গান বোধ হয় শুনিতে পাওয়া যায়।

পুরুষ কীর্তনিয়ার সমাদর বৃদ্ধি হওয়ায় উচ্চাঙ্গ কীর্তনের পুনরভ্যুদয় কিছু কিছু ঘটিতেছে। এক সময়ে রসিকদাস, প্রেমদাস প্রভৃতি কীর্তনে প্রভূত প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। রসিকের রসবোধ ছিল অসাধারণ। কি ভাবে গান করিলে লোকের মনোরঞ্জন করা যায়, তাহা তিনি বুঝিতেন। তাঁহার কণ্ঠও ছিল অতি মধুর। স্বীয় প্রতিভাগুণে তিনি বৈষ্ণবসমাজে বিখ্যাত গায়ক বলিয়া সর্বত্র সম্মানিত হইতেন। তিনি কীর্তনে 'কাটাধড়া' নামক তালের স্রষ্টা। সকলেই জানেন কীর্তনে করুণরসের প্রাধান্য। সেইজন্য পুত্রশোকাকুলা জননীর ক্রন্দনের সুর ও ছন্দ অবলম্বন করিয়া তিনি ঐ তালের উদ্‌ভাবন করেন। এক্ষণে মনোহরসাহী কীর্তনে অনেক গায়কের মুখে কাটাধড়ার গান শুনিতে পাওয়া যায়। প্রাচীনকাল হইতে 'ধড়া' একটি সুপরিচিত তাল ছিল। ধ্রুব তাল বা ধড়ার অনেকটা অনুরূপ বলিয়া রসিকদাস তাঁহার নূতন তালের নামকরণ করিলেন 'কাটাধড়া'। প্রেমদাসের কণ্ঠও ছিল অতি অপূর্ব। সেরূপ কণ্ঠ এখন আর বড় শুনিতে পাওয়া যায় না। ইঁহাদেরই সমসময়ে গণেশদাস অতি মিষ্ট গান করিতেন। বৎসরকয়েক পূর্বে তিনি দেহ রক্ষা করিয়াছেন। জীবিত গায়কদের মধ্যে কাহারও নাম বাদ দিয়া কাহারও নাম করিলে অবিচার করা হইবে। তবে ইঁহাদের মধ্যে একজনের নাম বোধহয় অসংকোচে করা যাইতে পারে: রামকমল ভট্টাচার্য—পাবনার অধিবাসী।[১] তিনি প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে কলিকাতায় আসিয়া কীর্তনগানে শহর মাতাইয়াছিলেন। তাঁহার এরূপ অপূর্ব শক্তি যে, কখনও কখনও দশ হাজার লোক মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার কীর্তন শুনিয়াছে। কীর্তনগানে এরূপ লোকসমাগম বোধহয় আর কখনও দেখা যায় নাই। তাহার বিশেষ একটি কারণ বোধ হয় এই যে তিনি নাচিয়া গাহিয়া কথকতার সুর দিয়া কীর্তন প্রচার করিয়াছেন যাহাতে সর্বসাধারণে কীর্তন গানের মর্ম সহজে বুঝিতে পারে। তাঁহার গানে

---

[১] ইনিও সম্প্রতি গত হইয়াছেন।

আধ্যাত্মিক ভাবের প্রাধান্য থাকিত বলিয়া অনেক অভিজ্ঞ শ্রোতা তাঁহার পদ্ধতি অনুমোদন করিতেন না। তাহা হইলেও এরূপ জনপ্রিয় কীর্তনসংগীত রামকমলের পূর্বে আর কখনও শোনা যায় নাই।

যাঁহারা কীর্তনের প্রাচীন প্রথা সংরক্ষণে প্রয়াসী, তাঁহারা কোনও প্রকার অভিনবত্ব পছন্দ করেন না। প্রাচীনপন্থী গায়কদের মধ্যে অদ্বৈতদাস পণ্ডিত-বাবাজি সমধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। যৌবনে সংসার ত্যাগ করিয়া তিনি বৃন্দাবন গমন করেন। এবং তথায় ভক্তিশাস্ত্র-অধ্যয়নে ও কীর্তনশিক্ষায় মনোযোগ দেন। কীর্তন-শিক্ষা ব্যপদেশে তিনি বাংলায় ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি পাঁচথুপীর 'চন্দ্রজি' (কৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্র) ও শ্রীখণ্ডের ঠাকুর এবং ময়নাডালের মিত্রঠাকুরগণের নিকট অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সহিত কীর্তন শিক্ষা করেন। পাঁচথুপী, ময়নাডাল, শ্রীখণ্ড, নবদ্বীপ এবং এইরূপ আরও দুই-একটি স্থান এখনও কীর্তনগানের জন্য বাংলাদেশে প্রসিদ্ধ হইয়া আছে।

১০

বৈষ্ণবধর্ম ও কীর্তন

বাংলাদেশের বহুস্থানে রাধাকৃষ্ণের মন্দির বর্তমান আছে। এই সকল মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের সেবা-ব্যপদেশে কীর্তনের অল্পবিস্তর অনুশীলন দেখা যায়। কোনও কোনও কৃষ্ণমন্দিরে প্রতিদিন, কোনও মন্দিরে পর্বের সময় কীর্তনের অনুষ্ঠান হয়। বৈষ্ণব তীর্থসমূহে পর্বের সময়ে কীর্তনের ব্যবস্থা করিতেই হয়, যথা—রাসের সময়ে রাসলীলা, হোলির সময়ে হোলিগান, ঝুলনের সময়ে ঝুলনগান, বসন্তপঞ্চমী উপলক্ষ্যে বসন্তগান ইত্যাদি। কিন্তু অনেক স্থলে উপযুক্ত গায়কের অভাবে যেন তেন প্রকারেণ সারিয়া দেওয়া হয়। নবদ্বীপে প্রতি বৎসরে 'ধুলোট' হয় অর্থাৎ বঙ্গের বহু কীর্তনওয়ালা সমবেত হইয়া

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর জন্মস্থানে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় (মহাপ্রভুর জন্মতিথি) আপন আপন কৃতিত্বের পর্যাপ্ত পরিচয় দিয়া থাকেন। এই সময়ে বহু 'যাত্রী' নবদ্বীপে যাইয়া কীর্তন শুনিয়া আসেন। তাঁহাদের দ্বারা কীর্তনওয়ালার যশঃ বাহিত হইয়া সমগ্র দেশে প্রচারিত হয়। শান্তিপুর, শ্রীখণ্ড, ঝামটপুর প্রভৃতি স্থানে প্রতি বৎসর পর্ববিশেষ বা মেলার সময়ে কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। ঝামটপুর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ-প্রণেতা কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্মস্থান। এখানে কীর্তন গান করিলে সারা বৎসর সফলতা লাভ করা যায় এই আশায় ঐ অমর কবির তিরোধান-উৎসবে কীর্তনওয়ালারা নিজ নিজ ব্যয়ে সেখানে গিয়া গান করিয়া থাকেন। শ্রীখণ্ড শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের স্থান বলিয়া তাঁহার তিরোভাব-তিথিতে শ্রীখণ্ডেও সমারোহের সহিত কীর্তন হইয়া থাকে। বহু বৈষ্ণব ভক্ত ঐ উপলক্ষে কাটোয়া ও শ্রীখণ্ডে সমবেত হন। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের স্থান বলিয়া কালনায়ও কীর্তনগানের অনুষ্ঠান হয়। এখানে গৌরাঙ্গমন্দিরে মহাপ্রভুর শ্রীহস্তলিপি রক্ষিত আছে। কেন্দুবিল্বে জয়দেবের তিরোভাব-মহোৎসব হয় এবং রামকেলিতেও রূপসনাতনের স্মৃতিপূজা উপলক্ষ্যে এক বৃহৎ উৎসব হইয়া থাকে।

বৈষ্ণব ভক্ত ও মহাপুরুষদিগের তিরোভাব-মহোৎসবে তাঁহাদের লীলাবিষয়ক যে কীর্তন হয় তাহাকে 'সূচক কীর্তন' বলা হয়। রূপ ও সনাতন গোস্বামীর সূচক, জীব গোস্বামীর সূচক, নরোত্তমদাস ঠাকুরের সূচক প্রভৃতি স্মৃতিবন্দনার এক অপূর্ব কৌশল। অদ্যাপি এই সূচক কীর্তন শুনিয়া ভক্তকুল অশ্রুপরিপ্লুত হইয়া থাকেন। সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবভক্ত ও নামকীর্তনিয়া শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজি বর্তমানে এই সূচক গানের একমাত্র ভাণ্ডারী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অশ্রু পুলক কম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিকভাব-সমন্বিত এই কীর্তন যিনি না শুনিয়াছেন, তাঁহাকে ঠিক বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন। এই সূচকগান মহাপুরুষ বা ভক্তগণের তিরোভাব-তিথি ব্যতীত গান করিবার রীতি নাই। বৃন্দাবনে সকল গোস্বামিগণের সূচক গান বা চরিতকীর্তন এখনও হইয়া থাকে।

সেইরূপ কীর্তনের কোন কোন পালাও সেই সেই পর্ব অতীত হইলে অন্য সময়ে গাহিবার রীতি অভিজ্ঞেরা অনুমোদন করেন না। যথা ঝুলন, নন্দোৎসব, হোলি, বসন্ত, ফুলদোল প্রভৃতি সেই সেই পর্বের দিন বা তাহার নির্ধারিত কয়েকদিনের মধ্যে ব্যতীত গীত হইবার উপায় নাই। অন্যান্য সংগীতের তুলনায় কীর্তনগানের সম্পর্কে স্বাধীনতা এইরূপে অনেকটা সীমাবদ্ধ। রাত্রিতে গোষ্ঠ বা কুঞ্জভঙ্গ, সকালে রাসলীলা বা উত্তরগোষ্ঠ গীত হয় না। খণ্ডিতা সকালে ব্যতীত হয় না, কুঞ্জভঙ্গ অতি প্রত্যুষে গাহিবার রীতি আছে। কেহ কেহ কলহান্তরিতা, মান প্রভৃতি বিকালে বা সন্ধ্যায় গীত হইলে শুনেন না। লীলার ক্রম অনুসারে পালার ক্রম নির্দিষ্ট হয়। সব সময়ে হয়তো এ নিয়ম রক্ষিত হয় না। কিন্তু বৈষ্ণবসমাজে এই নিয়ম-রক্ষার দিকে যথেষ্ট যত্ন দেখা যায়। তাহার আরও এক কারণ এই যে, সময় অনুসারে পালা নির্দিষ্ট হওয়ায় গানগুলির রাগরাগিণীও সেই ভাবে ব্যবস্থিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে কুঞ্জভঙ্গে ভৈরব, উত্তরগোষ্ঠে গৌরী এবং রাসে বেহাগের প্রাচুর্য দেখা যায়।

১১

কীর্তনের রাগরাগিণী

বৈঠকী গানে রাগরাগিণীর যেরূপ ক্রম আছে, কীর্তনেও সেইরূপ। অর্থাৎ কীর্তনগান ভারতীয় সংগীত-পদ্ধতিরই অন্তর্গত। তবে হিন্দুস্থানী গানের রাগরাগিণীতে বর্তমানে যে ধরাবাঁধা সর্গম দেখা যায়, কীর্তনে তাহা সব সময়ে অনুসৃত হয় না। এজন্য হিন্দুস্থানী পদ্ধতির গায়কেরা অনেকে কীর্তনকে উচ্চস্থান দিতে সম্মত হন না। কিন্তু একটু প্রণিধান করিলে দেখা যায় যে, কীর্তন এক অভিনব ঠাটের সংগীত। কোনও পদ্ধতিবিশেষকে হুবহু

অনুসরণ করিলে, শ্রেণীবিভাগে তাহার স্বতন্ত্র স্থান হয় কিরূপে? একটি উদাহরণ দিলে হয়তো আমার বক্তব্য বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে। সন্দেশ এবং রসগোল্লা উভয়ই সুস্বাদু মিষ্টান্ন; উপাদানও উভয়ের এক, কিন্তু সন্দেশ রসগোল্লা নহে এবং রসগোল্লাও সন্দেশ নহে। স্বাদুতার উৎকর্ষ রুচি হিসাবে; কেহ সন্দেশ, কেহ বা রসগোল্লার ভক্ত। রাগরাগিণী সম্বন্ধে কীর্ত্তনের উপাদান যে এক, ইহা জয়দেবের পদাবলী হইতে আরম্ভ করিয়া কমলাকান্ত, দীনবন্ধু দাস পর্যন্ত সমস্ত পদাবলীর সাংগীতিক নির্দেশ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। কোনও গানে গুর্জরী বা মালব, কোনও গানে ঝিঁঝিট খাম্বাজ বা সিন্ধুড়া, কোনও গানে জয়জয়ন্তী বেহাগ বা বিহাগড়া। এক্ষণে কথা এই যে, যে সকল রাগরাগিণীর নির্দেশ পদাবলীতে পাওয়া যায়, তাহা কি ঐ ঐ রাগরাগিণীর লক্ষণ অনুসারে গীত হয়, অথবা গায়কগণ নিজ নিজ ইচ্ছা অনুসারে তাহাকে অন্যরূপ করিয়া লয়েন?

কীর্ত্তনে যে রীতি বর্ত্তমানে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে প্রাচীন রাগরাগিণীর সমস্ত অবয়ব অনেক সময়ে ঠিক ঠিক মত পাওয়া যায় না। কীর্ত্তন-গায়ক যে সুরকে মল্লার বা বসন্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন, সে সুরে মল্লার বা বসন্তের সবগুলি পর্দা হয়তো পাওয়া যায় না। তবে ভীমপলশ্রী, ঝিঁঝিট, বেহাগ, জয়জয়ন্তী প্রভৃতি কতকগুলি রাগিণীতে বৈঠকী রীতিরই অনেকটা অনুবর্ত্তন করা হয়। এই যে পার্থক্য, কোন কোন সংগীতজ্ঞ ইহাকে ব্যভিচার বলিয়া মনে করেন এবং কীর্ত্তনগানকে সংগীতের কোঠায় নিম্নস্থান প্রদান করেন।

এখন দেখা যাউক, এই মত কতটা যুক্তিযুক্ত। এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বর্ত্তমানে যে কীর্তন প্রচলিত আছে তাহাতে রাগরাগিণীর প্রতি নিষ্ঠা তাদৃশ দেখা যায় না। আলাপচারি দ্বারা সর্গম করিয়া তত্তৎ রাগিণীতে গান করিলে অনেক সময়ে পার্থক্য ধরা পড়ে। কিন্তু খুব কম কীর্ত্তনিয়া সর্গমের দিকে দৃষ্টি দিয়া থাকেন। কীর্ত্তনে স্বরলিপির

ব্যবহার একরূপ নাই বলিলেই চলে। সেজন্য অভিজ্ঞের নিকট সুরের অঙ্গহানি সহজেই প্রতিভাত হয়। এরূপ কেন হয়, তাহারই কয়েকটি কারণ উল্লেখ করিতেছি—

প্রথমতঃ, কীর্তন এক অভিনব প্রণালী বা ঠাটের সংগীত। কাজেই সুরসংস্থানে ইহাকে অনেকটা স্বতন্ত্রভাবে চলিতে হইয়াছে। অর্থাৎ প্রচলিত রীতিকে ইচ্ছামত পরিবর্তন করিয়া লইতে হইয়াছে।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, বর্তমানে কীর্তনিয়ার অজ্ঞতাবশতঃ সুরপরিচয়ে বিভ্রাট ঘটিয়াছে। অর্থাৎ কীর্তনিয়া যখন বলিলেন শংকরাভরণ বা বৃন্দাবনী সারঙ, তখন তাহার সহিত তত্তৎ রাগিণীর ঠিক মিল থাকে না।

তৃতীয় কারণ, যাঁহারা উচ্চাঙ্গের কীর্তন গান করেন, তাঁহারা রাগরাগিণী অপেক্ষা প্রথাগত সুরের দিকেই বেশী মনোযোগ দেন। অর্থাৎ পূর্বে মহাজনদের দ্বারা গানটি কিরূপ সুরে গাওয়া হইত, তাহারই মর্যাদা তাঁহারা অধিক দেন। পূর্ব হইতে কতকগুলি সুর ওস্তাদ বা মহাজনকর্তৃক গীত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারই অনুকরণচেষ্টায় কীর্তনগান সার্থক হয়। অবশ্য ঐ সকল মহাজন রাগরাগিণীতে পারদর্শী ছিলেন এবং সেইজন্য বিভিন্ন সুরের 'রাসায়নিক সংমিশ্রণ' করিয়া তাঁহারা এক অপূর্ব গীতরস সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের ন্যায় অভিজ্ঞতার অভাব-বশতঃ গীতের উত্তরাধিকারিগণ হয়তো সে সুরশিল্প আয়ত্ত বা রক্ষা করিতে পারেন নাই। এইজন্য কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, কীর্তনগানের ধারা অত্যন্ত মামুলি হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু শিল্পে গতানুগতিকতা কতকটা রক্ষা না করিলে তাহার আভিজাত্য থাকে না। প্রাচীনের মর্যাদা রক্ষা করিয়া, শিল্পী যদি তাঁহার উদ্ভাবনী প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন, তবেই তাঁহার শিল্প বা সংগীত সজীবতার দাবি করিতে পারে।

চতুর্থ কারণ, বহুদিন হইতে কীর্তনগানের সমাদর কমিয়া গিয়াছে। পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বা জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহের অভাব ঘটিলে কোনও

শিল্প কখনও উন্নতি লাভ করিতে পারে না। বৈষ্ণব ভাবধারার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কীর্তনের প্রসার হইয়াছিল; আবার তাহার অভাবে কীর্তনেরও অবনতি অনিবার্য হইয়া উঠিল। এই কারণে উপযুক্ত অভিজ্ঞ গায়কমণ্ডলী কীর্তনের প্রতি সেরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে বিরত হইলেন। বর্তমান কালেও রাগরাগিণী রীতিমত শিক্ষা করিয়া কীর্তনগান শিখিতে অগ্রসর হইয়াছেন এরূপ লোকের সংখ্যা বিরল। অথচ এরূপও কখন কখন দেখা যায় যে, কীর্তনের গায়ক প্রভূত অর্থবিত্তশালী হইয়াছেন এবং অন্য কোনও প্রণালীর গায়কের মধ্যে সেরূপ সুসারসম্পত্তিশালী লোকের নিতান্তই অভাব।

পঞ্চম কারণ, কীর্তনে ভগবদ্‌বিষয়ের সম্বন্ধ আছে বলিয়া কীর্তন-সুরের বৈশিষ্ট্য। বস্তুতঃ এসম্বন্ধে খুব কম সংগীতই কীর্তনের সমকক্ষতা দাবি করিবার যোগ্য। চিত্তে আধ্যাত্মিক ভাব স্ফুরণ করিবার জন্য কীর্তনের যে কলাকৌশল সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাকে উপেক্ষা করা চলে না। পূর্বে যেসকল রসের কথা বলা হইয়াছে, সেই রস সংগীতের মধ্য দিয়া ফুটাইতে হইলে এক দিকে চাই সেই সেই রসোপযোগী কথার যোজনা আর তাহার মধ্যে সেই রসোদ্দীপনকারী সুর। একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, কীর্তনে যে সুরের কারুকার্য দেখা যায়, তাহা রসের উদ্দীপনায় সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যেই কল্পিত। মনে করুন খণ্ডিতার বক্রোক্তি সুরে ফুটাইতে হইবে—

ভাল হৈল আরে বন্ধু আইলা সকালে।
প্রভাতে দেখিলাম মুখ দিন যাবে ভালে।
বন্ধু তোমার বলিহারি যাই।
ফিরিয়া দাঁড়াও তোমার চাঁদ মুখ চাই॥
আই আই পড়েছে মুখে কাজরের শোভা।
অধরে সিন্দুরবিন্দু মুনির মনোলোভা॥ ইত্যাদি

চণ্ডীদাসের এই প্রসিদ্ধ গানটি করিবার সময় সুরের দ্বারা কীর্তনগায়ক যে ব্যঙ্গের অবতারণা করেন, তাহার তুলনা দেখা যায় না। কাজেই এখানে সুরশিল্প সেই উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত হইয়াছে। রাগিণীর (ভৈরব) প্রতি অত্যধিক মনোযোগ দিলে সে উদ্দেশ্য হয়তো সফল হইত না। এরূপ স্থলে রাগিণীকে প্রধান করা হয় নাই, ভাবকেই প্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছে। সকলেই স্বীকার করিবেন যে, গানের সুরে ব্যঙ্গের ভাব ফুটাইয়া তোলা অত্যন্ত কঠিন। এখানে কীর্তনগায়ক সেই কঠিন পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন মনে হয়। তবে রাগিণীর ব্যতিক্রম হয়, এরূপ কোনও চেষ্টা পরিহার করিবার দিকেই কীর্তনগায়কের লক্ষ্য থাকে।

একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কীর্তনে 'সম্পূর্ণ জাতি'র গানই প্রচলিত অর্থাৎ সা ঋ গম প্রভৃতি সাতটি স্বরই সব গানে ব্যবহৃত হয়। ঔড়ব (পঞ্চ স্বরা) ও ষাড়ব (বা খাড়ব—ষট্‌স্বরা) জাতির গান প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় না। সম্পূর্ণ জাতির গান বলিয়াই হউক অথবা গায়ক-মহাজনদের উদ্‌ভাবিত সুর বলিয়াই হউক, কতকগুলি গানকে 'জাতগান' বা জাতি-গান বলা হয়। প্রাচীনপন্থী কীর্তনগায়কগণ 'জাত সুরে'র গানই করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া এই সকল সুরের যে আভিজাত্য আছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

অভিজ্ঞ সুরশিল্পীরা এই সকল সুরের মধ্যে অনেক প্রাচীন রাগরাগিণীর সন্ধান পাইতে পারেন। সঙ্গীতরত্নাকর বা সঙ্গীতপারিজাত প্রভৃতি শাস্ত্রে রাগরাগিণীর যে রূপের সন্ধান আমরা পাই তাহা কালবশে অনেকস্থলে পরিবর্তিত হইয়াছে। সঙ্গীতজ্ঞরা গবেষণা করিলে সেই প্রাচীন রূপ হয়ত কীর্ত্তনের মধ্যে কিছু কিছু পাইতেও পারেন।

১২

কীর্তন ও ভাব

অনেকে মনে করেন কীর্তন ভাবপ্রধান সংগীত। অর্থাৎ চিত্তে বিশেষ বিশেষ ভাব-সৃষ্টিই কীর্তনের প্রয়োজন। সুতরাং কীর্তনে সুর ও তাল গৌণ ব্যাপার। তালের কথা পরে বলিতেছি। কিন্তু সাধারণভাবে ইহা বলা আবশ্যক যে, সংগীতকলা সুর ও তাল ব্যতীত সিদ্ধ হইতে পারে না। কীর্তন যদি সংগীতের একটি প্রকারভেদ হয়, তাহা হইলে ইহার সুর-শিল্প ও তাল-নৈপুণ্য উভয়ই বিচারের বিষয় হওয়া উচিত। সুরের দৈন্য বা অভাব বা ত্রুটি থাকিলে সে সংগীত যে উচ্চাঙ্গের সংগীত বলিয়া পরিগণিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে না, ইহা এক প্রকার সর্বসম্মত সত্য। সুতরাং সংগীতের মধ্যে কীর্তনের স্থান বিচার করিতে হইলে প্রথমেই সুর ও তালের দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে। ভাবের দোহাই দিয়া সুর ও তালের দায়িত্ব হইতে কোনও ক্রমেই অবসর গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

অনেকের মনে এইরূপ একটা ধারণা আছে যে, যেহেতু কীর্তন ভাবপ্রধান সংগীত সেই হেতু সাধারণ সংগীতের মাপকাঠি দিয়া ইহার বিচার করিতে যাওয়া উচিত নহে। এই ধারণা ঠিক কিনা তাহার বিচার করিতে হইলে 'ভাব' বলিতে কি বুঝায়, তাহার আলোচনা আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, 'ভাব' সম্বন্ধে আমাদের অনেকের মধ্যে কোনও পরিস্ফুট ধারণা আছে বলিয়া বোধ হয় না। 'ভাব' অর্থ যদি ভক্তি হয়, তবে অবশ্যই কীর্তন ভাবময় সংগীত। কীর্তন ব্যতীত অন্য সংগীতেও ভক্তির প্রাধান্য যে নাই, তাহা নহে। 'ভাব' যদি বিহ্বলতা বা আবেশ অর্থে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে কীর্তনে যে উহা অধিক পরিমাণে আছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। গায়ক বা শ্রোতার মনে যখন এই বিহ্বলতা আসে, তখন আর সুর বা তালের অনুসন্ধান থাকিতে পারে

না। এরূপ ভাববিহ্বলতা সংগীতমাত্রেই থাকিতে পারে এবং অনেক স্থলে দেখিতেও পাওয়া যায়। গায়ক যেন কোনও দৈব প্রেরণার (inspiration) বশীভূত হইয়া তন্ময়ভাবে গান করিতেছেন। বস্তুতঃ এইরূপ গানেই মানুষের হৃদয় বিগলিত হয়—সে কীর্তনই হউক, বাউলই হউক বা উচ্চাঙ্গের বৈঠকী সংগীতই হউক। কীর্তনগায়কের স্বরশিল্পে এই লক্ষ্যটি থাকে, একথা স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে সুর ও তালের প্রতি উপেক্ষা আছে, এরূপ বলা চলে না।

'ভাব' বলিতে যদি মনোভাব বুঝায়, তাহা হইলে অর্থের কথা আসিয়া পড়ে। অর্থাৎ এই প্রশ্ন উঠে যে, সংগীতে সুর প্রধান অথবা কথা প্রধান? সুর এবং কথার সম্বন্ধ লইয়া অনেক তর্ক-বিতর্ক এ-পর্যন্ত হইয়াছে। বিশেষজ্ঞেরা এসম্বন্ধে একমত হইতে পারেন নাই। কেহ কেহ মনে করেন যে সেই সংগীতই শ্রেষ্ঠ যাহা কথাকে অতিক্রম করিয়া শুধু সুরের বিনাসুতের মালা গাঁথিতে পারে। সুরবিস্তারের দ্বারা যেখানে চিত্তকে অভিভূত করিয়া তোলা যায়, তাহাই সংগীতের আত্মা। 'সুর ও সংগতি' নামক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ এইরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু কবিবর মনেপ্রাণে কথা বা কাব্যসংগীতের উপাসক ছিলেন বলিয়া মনে হয়। সুরের আবেদন যে উপেক্ষণীয় নহে, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু সে আবেদন যদি কথার সহযোগে পরিপূর্ণ, নিবিড় ও মর্মস্পর্শী হইয়া উঠে, তাহা হইলে তাহাকে অগ্রাহ্য করা যায় কি? কীর্তনে সুরের আবেদন যথেষ্ট আছে। বৈষ্ণব গীতকারেরা শ্রুতির নিপুণ কারুকার্যে সুরকে পরম উপভোগ্য করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। উচ্চাঙ্গ কীর্তনে সুরের যেরূপ সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখা যায়, তাহাতে একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে সুরকে ইহারা যথেষ্ট উচ্চ স্থানেই বসাইয়াছিলেন। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, কীর্তন শুধু গীত নহে, কীর্তনগান সুরের বিলাসমাত্র নয়, কীর্তনের স্বরশিল্প শুধু সংগীতের বিকাশের জন্য কল্পিত নয়। কীর্তন সুর, কাব্য ও ধর্মের ত্রিবেণী। ইহার কোনওটিকে উপেক্ষা করা

চলে না। সুরের আবেদনে প্রাণ মাতিয়া উঠিবে, কাব্যের অলঙ্কারে ও শব্দের ঝংকারে চিত্ত মুগ্ধ হইবে এবং ধর্মের প্রেরণায় অশ্রু কম্প পুলক প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাব হৃদয়ে জাগিবে—ইহাই সংক্ষেপে কীর্তনসংগীতের অভিপ্রায়। কবিগুরু আমাকে নিজমুখে বলিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর মধ্যে আর কোথায়ও এরূপ সমন্বয়ের চেষ্টা দেখা যায় না। কথা ও সুর কীর্তনসংগীতে যেভাবে মিশিয়াছে, তাহা বাস্তবিকই চিরদিন ভাবুকজনের বিস্ময় উৎপাদন করিবে। একথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, শ্রীচৈতন্যের সময় হইতে কীর্তনসংগীত বৈষ্ণবধর্মের প্রধান বাহন হইয়াছে। গানের দ্বারা মনঃসংযোগের চেষ্টা, গানের দ্বারা একাগ্রতা আনয়ন, গানের দ্বারা প্রাণে ব্যাকুলতার সৃষ্টি, এক কথায় গানের মাধ্যমে ভজন সাধন উপাসনা—ইহা যেরূপ বৈষ্ণবধর্মেই দেখা যায় এরূপ আর কুত্রাপি নহে।

'ভাব' সম্বন্ধে পূর্বেই অষ্ট সাত্ত্বিকের কথা বলা হইয়াছে। সেগুলি এই : অশ্রু, কম্প, স্বেদ, পুলক, বৈবর্ণ্য, স্তম্ভ, স্বরভঙ্গ ও প্রলয় বা মূর্ছা। কীর্তন এইসকল ভাবের উদ্দীপক। এই সকল ভাবকে সাত্ত্বিক বিকার বলা হয় তখনই যখন শারীরিক প্রয়োজনে নিষ্পন্ন না হইয়া ইহারা নির্মল অন্তঃকরণপ্রবৃত্তি হইতে সমুত্থিত হয়। সাংসারিক বা শারীরিক কোনও দুঃখ নাই, অথচ অবিরলধারে অশ্রু ঝরিতেছে, থাকিয়া থাকিয়া দেহ কাঁপিয়া উঠিতেছে, মুহুর্মুহুঃ রোমাঞ্চ (পুলক) হইতেছে, ঘর্মের উদ্গমে শরীর আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছে এবং পরিশেষে সংবিৎ-লোপ হইয়া গায়ক ও শ্রোতা ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছেন—এ দৃশ্য কীর্তনের আসরে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। বিশুদ্ধ অনাবিল সাধুচিত্তবৃত্তি হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া ইহাদিগকে সাত্ত্বিক ভাববিকার বলা হয়। ইহার সবগুলি ভাবেরই যে একত্র বিকাশ দেখা যায় তাহা নহে। ইতিহাস হইতে যতদূর জানা যায় তাহাতে শ্রীচৈতন্যদেবে প্রায়ই এই অষ্ট সাত্ত্বিকের একত্র বিকাশ দেখিতে পাওয়া যাইত। এইসকল ভাব নির্মল কৃষ্ণপ্রেম হইতে সঞ্জাত হয়। কৃষ্ণনাম শুনিয়া বা শ্রীকৃষ্ণের বিরহে শ্রীরাধার

এইরূপ অষ্ট সাত্ত্বিকের উদয় হইত। সেইজন্য শ্রীরাধাকে মহাভাব-স্বরূপিণী বলা হইয়া থাকে।

প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
মহাভাবস্বরূপিণী রাধাঠাকুরাণী।
—চৈতন্যচরিতামৃত।

শ্রীরাধা যখন কৃষ্ণনাম শুনিয়া অবশ হইতেছেন, তখন এই সাত্ত্বিকভাবের আবির্ভাব বুঝিতে হইবে।

জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে।
—চণ্ডীদাস।

কৃষ্ণনাম শুনিয়া মহাপ্রভুরও এইরূপ আবেশ হইত, সেইজন্য তাঁহাকেও বলা হয় 'রসরাজ-মহাভাব'। 'রসরাজ' অর্থে রসিকশেখর বা মূর্তিমান মধুর রস।

ভাবের আর একটি অর্থ হইতেছে রস। অতএব এই প্রসঙ্গে রসের উল্লেখ করা কর্তব্য।

১৩

কীর্তন ও রস

'রস' বলিতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি 'আনন্দ'। জড়জগতের রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শের মধ্যে দ্বিতীয়টি আমরা জিহ্বার দ্বারা আস্বাদন করিতে পারি। এইজন্য ইহার এক নাম রসনা। কটু তিক্ত কষায় লবণ অম্ল মধুর এই ছয়টি রসনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য রস। আবার যাহা মনের আস্বাদ্য তাহাও রস নামে পরিচিত। কোনও বস্তু দর্শন করিলে বা কোনও চিন্তা চিত্তে উদিত হইলে যে অনির্বচনীয় আনন্দ অন্তঃকরণে অনুভূত হয়, তাহাকেও রস বলা হয়। কাব্যপাঠে বা অভিনয়দর্শনেও এইরূপ আনন্দ মনোমধ্যে উদিত হয়। সেইজন্য অলংকার-শাস্ত্রে নয় প্রকার রসের উল্লেখ আছে: আদি, বীর, করুণ,

অদ্‌ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র ও শান্ত। বাৎসল্যরস গণনা করিলে রসের সংখ্যা হয় দশ। বৈষ্ণবদের মতে সাহিত্যের নয়টি রস গৌণ। মুখ্যরস পাঁচটি, যথা, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এখানেও রসের অর্থ—যাহা আস্বাদ্য, কিন্তু এ আস্বাদন প্রাকৃত বস্তুর নহে, ইহা পারমার্থিক আস্বাদন। কারণ এই অনিত্য সংসারে একমাত্র আস্বাদ্য বা উপভোগের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ।

রসিকশেখর কৃষ্ণ পরমকরুণ।
—চৈতন্যচরিতামৃত।

কীর্ত্তনে এই রসের বিন্যাসদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উপভোগকেই বাস্তব রূপ দান করা হইয়াছে। পূর্ব্বেই শান্ত দাস্য প্রভৃতি রসের উল্লেখ করা হইয়াছে; তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এখানে কীর্ত্তনের রস প্রসঙ্গে ইহা বলা একান্ত আবশ্যক যে, কীর্ত্তনের গীত যেরূপ এই রসবিভাগ অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে, ভক্তও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন রসের অধিকারীরূপে বিভক্ত; কেহ শান্ত, কেহ সখ্য, কেহ বা মধুর রসের অধিকারী। শান্তরস ভগবদ্‌ভক্তজনের মনের সাধারণ স্থায়িভাব। সংসারের অনিত্যতা এবং ইহার চিরচঞ্চল সুখদুঃখরূপ ছায়াবাজির স্বরূপ যতই অন্তঃকরণে উপলব্ধি হইবে, ততই চিত্ত প্রশান্ত স্থির অপ্রমত্ত হইয়া উঠিবে। সুতরাং এই বৈরাগ্যমিশ্রিত মনোভাব সমস্ত ভক্তচিত্তের স্বাভাবিক ভিত্তি, এইজন্য বৈষ্ণবেরা শান্তরসকে রসগণনায় শ্রেষ্ঠ স্থান দেন না। ইঁহাদের মতে চারিটি রস প্রধান—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর।

দাস্য সখ্য বাৎসল্য শৃঙ্গার চারি রস।
চারি ভাবে ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ॥

... ...

দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার।
চারি ভাবে চতুর্বিধ ভক্তই আধার॥
নিজ নিজ ভাবে সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে।
নিজ ভাবে করে কৃষ্ণ সুখ-আস্বাদনে।
—চৈতন্যচরিতামৃত, আদি।

এইসকল রসের মধ্যে আবার আদি বা শৃঙ্গার অর্থাৎ মধুর রসই অধিক আস্বাদ্য। সেজন্য মধুর রসের গানই কীর্তনে অধিক।

ভগবানকে ভজনা করিবার যে চারি প্রকার রীতি (রস) কথিত হইল, তাহার মধ্যে মধুর রসের ভক্তই সর্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু আমরা যদি মনে করি যে সকলেই মধুর রসের ভক্ত, তাহা হইলে ভুল হইবে। এমন বহু লোক দেখিয়াছি যাঁহারা মধুর রসের পদাবলী শ্রবণ করেন না। অর্থাৎ অভিসার, কলহান্তরিতা, মাথুর প্রভৃতি পালার গান হইলে তাঁহারা সে-স্থান ত্যাগ করেন। এমন অনেক ভক্ত আছেন যাঁহারা কেবল দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য রসের অধিকারী। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা তাঁহারা শুনেন না। দাস্য ও সখ্য রসের ভজন অন্যান্য ধর্মেও দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবানকে প্রভু বা বন্ধু বলিয়া মনে করা সকল ধর্মেই চলে। কিন্তু বৈষ্ণবদের বাৎসল্য রসের তুলনা বোধ হয় বিরল। ভগবানকে সন্তান বলিয়া স্নেহ করা, সেইভাবে তাঁহার সেবা করা অন্যত্র প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। বাৎসল্য রসের সেবক যাঁহারা, তাঁহারা নন্দ-যশোমতীর অভিমানে ভাবিত হইয়া কৃষ্ণকে প্রতিপাল্য জ্ঞানে আদর করেন। এই বাৎসল্য রসের গান গোষ্ঠলীলা, উত্তরগোষ্ঠ প্রভৃতি পালায়, শুনিতে পাওয়া যায়। ভগবানকে অপত্যবুদ্ধির দৃষ্টান্ত অন্যত্র একান্ত বিরল। ভগবানকে পিতা বা মাতা বা বন্ধুভাবে ভজনা করিবার দৃষ্টান্ত অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। পতিভাবে ভজনা করিবার পদ্ধতিও অজ্ঞাত নহে। St. Catherine of Theresa এবং Carmelite Nunsদের মধ্যে যীশু খৃস্টকে পতিভাবে উপাসনা করিবার প্রণালী দেখা যায়। ইহাঁরা Brides of Christ বা খ্রীস্টের পাত্রী বলিয়া পরিচিত। কার্মেলাইট্ সন্ন্যাসিনীরা এতদূর ভাবাবিষ্ট যে তাঁহারা অন্য পুরুষের মুখাবলোকন পর্যন্ত করেন না। তাঁহারা যে-মঠে থাকেন সে-মঠে কোনও পুরুষের প্রবেশাধিকার নাই। যদি কখনও রাজমিস্ত্রী বা অন্য মজুরদের প্রবেশ আবশ্যক হয়, তখন তাহাদের গলায় ঘণ্টা বাঁধিয়া

দেওয়া হয় অথবা মঠাধিকারিণীদের পুর্বে সংবাদ দেওয়া হয় যাহাতে তাঁহারা নির্জন স্থানে অপেক্ষা করিতে পারেন।

কিন্তু বৈষ্ণবদের বাৎসল্য রসটি অতি অপূর্ব। এই রসের এবং অন্যান্য রসের বৈশিষ্ট্য এই যে, স্বার্থের কোনও সন্ধান ইহার মধ্যে নাই। সাংসারিক হিসাবে পুত্রের প্রতি মাতৃস্নেহের মধ্যে যতই আত্মবিস্মৃতি থাকুক, ইহা একেবারে বিশুদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু ভগবানের প্রতি নন্দ-যশোদার যে অপত্যস্নেহ, উহা একান্তভাবে বিশুদ্ধ অর্থাৎ কিছুমাত্র স্বার্থের সন্ধান উহাতে ছিল না। আমার যাহা হয় হউক, পুত্র আমার যেন কিছুমাত্র কষ্ট না পায়—এইরূপভাবে ভগবৎসেবা বিশুদ্ধ বাৎসল্যরসের উপজীব্য।

রসাভাস—রসের আভাসমাত্র বর্তমান অথচ যেখানে প্রকৃত রসের অভাব তাহাকে রসাভাস বলে। রসাভাস বা রসদুষ্টি বা অনুচিত রস কীর্তনে অত্যন্ত দোষাবহ। কীর্তনিয়াকে অতি সন্তর্পণের সহিত এই রসাভাস-দোষ পরিহার করিতে হয়। মনে করুন, কীর্তনিয়া মধুর বা আদিরসের গান করিতেছেন, এমন সময়ে যদি তিনি পরকালের কথা উপস্থাপিত করেন, তাহা হইলে সে গান অত্যন্ত শ্রুতিকটু হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যখন রূপ-গুণ-যৌবনশালিনী গোপবালারা যমুনাতীরে পারে যাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, তখন যদি গায়ক নাবিকরূপী শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া বলান যে তিনি ভবপারের কর্ণধার, জীবকে ভবপারে লইয়া যাইবার জন্য অনাদি কাল হইতে তিনি খেয়া দিতেছেন, তাহা হইলে সেখানে রসাভাস-দোষ বা রসভঙ্গ হইল বলিতে হইবে। মনে করুন, বাসরঘরে বরকে ঘেরিয়া কুটুম্বিনীর দল আনন্দোল্লাসে মগ্না, বরকে গান গায়িবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন, তখন বর যদি গান ধরেন,

বাঁশের দোলাতে চড়ে কে হে বটে
যাচ্ছ তুমি শ্মশানঘাটে।

তাহা হইলে তাহা যেমন শ্রুতিকটু হয়, কীর্তনে রসাভাস অনেক সময়ে তেমনি রসপুষ্টির বিরোধী হইয়া পড়ে।

বৈষ্ণবশাস্ত্রে রস এক অপূর্ব সৃষ্টি। উহার বিভাব, অনুভাব সঞ্চারিভাব আদি ক্রম অনুশীলন না করিলে কীর্তন সর্বাঙ্গসুন্দর হয় না। পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে এই বিষয়টি পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, মহাজনপদাবলী সুরলয় সংযোগে শ্রুতিমধুররূপে পরিবেশন করিলে, তাহাকেই উচ্চাঙ্গের কীর্তন বলে। মহাজনপদাবলীর মধ্যে প্রধান রস শৃঙ্গাররস। সখ্য বাৎসল্য ও দাস্য রসের বহু পদ থাকিলেও গানের পক্ষে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হইতেছে পদাবলীর আদিরস। অর্থাৎ অধিকাংশ পদাবলী প্রেমকবিতা। এই প্রেমকবিতা রাধাকৃষ্ণ ও তাঁহাদের সখীবৃন্দকে কেন্দ্র করিয়া রচিত। সুতরাং প্রত্যেকটি পদেই আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত আছে—অর্থাৎ প্রত্যেক রসেরই প্রবাহ চলিয়াছে সেই অনন্ত সাগর-পানে যেখানে সকল হৃদয়বৃত্তি বাঞ্ছিতকে পাইয়া চরমচরিতার্থতা লাভ করে। কিন্তু কীর্তনের সর্বপ্রধান সতর্কতা আবশ্যক হয় এইখানে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমবর্ণনায় যথাসম্ভব আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বর্জন করিয়া গান করিতে না পারিলে কাব্যের মাধুর্য এবং গীতের সার্থকতা উভয়ই নষ্ট হইয়া যায়। এখানেই বৈষ্ণব-কবি এবং বৈষ্ণব-গায়কের চরম পরীক্ষা। বৈষ্ণব-কবি পরমার্থতত্ত্ব বলিবেন প্রেমের মধ্য দিয়া, স্নেহের মধ্য দিয়া, আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়া। কিন্তু তিনি কাব্যের রসমাধুর্য নষ্ট করিতে চাহেন না। কাব্যহিসাবে, রসপরিবেশন হিসাবে তাঁহার কাব্য উপভোগ্য হইবে, অথচ তাহার মধ্যে থাকিবে প্রিয়তমের সান্নিধ্যলাভের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা। এই যে সর্বপ্রকার বাধাহীন সম্পূর্ণ স্বাধীন প্রেম, শ্রীজীব-গোস্বামী ইহাকে মুক্তি অপেক্ষাও সুদুর্লভ বলিয়াছেন। এই অপ্রাকৃত প্রেমের গীত কীর্তন, অথচ কীর্তন-গায়ক যদি সে কথা স্পষ্টভাষায় প্রকাশ করেন, তবেই তাঁহার কীর্তন ব্যর্থ হইল। সহজ প্রেমকেই আখরের সাহায্যে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে; কবি যে চিত্রটি আঁকিয়াছেন, তাহারই সৌন্দর্য ও মাধুর্য কীর্তনিয়া

পরিবেশন করিবেন তাঁহার শিল্পশৈলীর দ্বারা। তত্ত্ব ও লীলার সঙ্গে যে নিগূঢ় রহস্যময় সম্বন্ধ আছে, কথকতায় বা ভাগবত-ব্যাখ্যায় বক্তা তাহা পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু কীর্তনিয়া লীলার চমৎকারিত্ব বর্ণনা করিবেন, তত্ত্বকথার দ্বারা তাহাকে রূপকমাত্রে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবেন না। একটি দৃষ্টান্ত দিলে কথাটি সহজে বুঝিতে পারা যাইবে—

সই কেবা শুনাইলে শ্যামনাম।
কানের ভিতর দিয়া   মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥

এই গানে নামের মাহাত্ম্য বা প্রতাপ বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু এই মধুর পদটি গান করিতে গিয়া যদি কেহ শ্যামনাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া পরকালের পাথেয় সঞ্চয় করিবার উপদেশ দেন, তবে তাঁহার গান অশ্রাব্য হইবে। তাহার কারণ ঐ গানটির কবিত্বই সর্বাগ্রে উপভোগ্য, উহার মধ্যে যে কবিত্বপূর্ণ প্রেমতন্ময়তা আছে তাহাই পরম আস্বাদ্য, তাহাকে ক্ষুণ্ণ করিবার অধিকার কীর্তনিয়ার নাই।

কীর্তনে আখর—রসাভাস-দোষ অতি সন্তর্পণে পরিহার করিতে হয় বলিয়াছি। তাহার কারণ এই যে কীর্তনগানটি যেমন রচিত হইয়াছে, তেমনি গান করিলেই হয় না। অন্য সংগীতের সঙ্গে কীর্তনের একটি মুখ্য বৈলক্ষণ্য এই যে এই গানে গায়ক ইচ্ছামত অলংকার বা আখর (অক্ষর) যোজনা করিতে পারেন। গানের অর্থ বিশদ করিবার জন্য, অন্তর্নিহিত ভাবকে পরিস্ফুট করিবার জন্য, রচয়িতার গূঢ় মনোভাবকে সুরের বেদনায় প্রকাশ করিবার জন্য আখর দেওয়া হয়। গায়ক নিজে যাহা যোজনা করেন, তাহাই আখর। কোনও কোনও সময় সুরের পোষকতায় আখরের স্থলে পদের অংশবিশেষের পুনরাবৃত্তিও করা হয়—অর্থাৎ গায়ক নিজের কথা না জুড়িয়া পদকর্তার ভাষাই হুবহু ব্যবহার করেন—

তাহাকেও 'আখর' বলা হয়। কিন্তু আখর অর্থে প্রধানতঃ গায়কের স্বকীয় যোজনা। অনেক সময়ে এইসকল আখর পূর্ববর্তী গায়কেরা রচনা করিয়া গিয়াছেন, বর্তমান গায়ক তাহারই আবৃত্তি করেন। আবার অনেক সময়ে গায়ক নিজ উদ্‌ভাবনী শক্তির সাহায্যে ভাবপোষক কথা সংযোজিত করেন। গায়কের কবিত্বশক্তি ও সুরতালের নৈপুণ্য থাকিলে এই সকল আখর অনেক সময়ে তত্তৎ পদাবলী অপেক্ষাও শ্রুতিমধুর হয়। কিন্তু এই-খানেই বিপদ! অনেক অল্পশক্তিসম্পন্ন লোক আখর-যোজনার প্রলোভন সংবরণ করিতে না পারিয়া এমন কথা হয়তো বলিয়া ফেলেন, যাহা রস-পরিপোষক তো নয়ই, বরং তাহার বিপরীত। সে সকল স্থলে রসিকসমাজ অত্যন্ত মর্মাহত হন। এই জন্যই আখর দিবার প্রলোভন সংযত না করিলে কীর্তনগান পীড়াদায়ক হইয়া উঠিতে পারে। কারণ রসিক ভক্তগণ এরূপ রসাভাসদোষ সহ্য করেন না।

কীর্তনের এক-একটি পালা একটি খণ্ডকাব্য। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের কোনও একটি লীলা কয়েকটি মহাজনপদাবলীর সাহায্যে জীবন্তভাবে চিত্রিত করাই কীর্তনের উদ্দেশ্য। পূর্বেই এইসকল পালার সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু কি ভাবে এই পালাগান নিষ্পন্ন হয়, তাহা বলা হয় নাই। সাধারণতঃ কীর্তনগায়ক বিভিন্ন পদকর্তার বিভিন্ন পদ বাছিয়া তাহাই পালার আকারে সাজাইয়া লন। বস্তুতঃ যাত্রার পালা যেমন নির্দিষ্ট গান ও কথোপকথনের মধ্য দিয়া নির্বাহিত হয়, কীর্তনের পালা সেরূপ নহে। মনে করুন অনুরাগের এক পালা গান হইবে ; গায়ক ইচ্ছামত একটি 'তদুচিত' গৌরচন্দ্রিকা বাছিয়া লইলেন—

কি ক্ষণে দেখিলাম গোরা নবীন কামেরি কোঁড়া
সেই হইতে রইতে নারি ঘরে। ইত্যাদি।
—লক্ষ্মীকান্ত।

তার পরে তিনি গাহিতে পারেন—

বেলি অবসানকালে একা গিয়াছিলাম জলে। ইত্যাদি।

—বসু রামানন্দ।

অথবা—

চিকণ কালিয়া রূপ মরমে লেগেছে গো
ধরণে না যায় মোর হিয়া।

—জ্ঞানদাস।

অথবা—

রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি
পুলক না তেজই অঙ্গ।

—গোবিন্দ দাস।

অতএব বুঝা যাইতেছে যে, গায়ক মহাজনপদাবলী হইতে বিভিন্ন পদকর্ত্তার পদ লইয়া নিজের ইচ্ছামত পালা সাজাইয়া থাকেন। এইরূপ সাজাইতে গিয়া কিন্তু পৌর্বাপর্য রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। এখানে গায়কের নিপুণতা ধরা পড়ে। তাঁহার যদি অনুক্রম-জ্ঞান না থাকে, তবে তাঁহার সে গানও রসাভাসদুষ্ট হইয়া পড়ে। এই দোষ হইতে অব্যাহতিলাভ করিবার জন্য কীর্তনগায়ক নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়া অনেক সময়ে পূর্ববর্তী মহাজনদের অনুসরণ করেন, অর্থাৎ যে সব পালা আগে হইতে সাজানো আছে, তাহারই অনুবৃত্তি করেন।

১৪

কীর্তনের তাল

সমস্ত ভারতীয় সংগীতে তালের প্রাধান্য বিশেষ লক্ষ্য করিবার বস্তু। সংগীতকারেরা বলেন যে, তাল বিনা সংগীতের প্রতিষ্ঠা নাই। তাহার কারণ এই যে, সুর সহজেই ছন্দকে অবলম্বন করিয়া সার্থক হয়। শোকাতুরা রমণীরা যে বিনাইয়া বিনাইয়া রোদন করেন, তাহারও মধ্যে ছন্দ আছে। এই ছন্দ নানাভাবে মুকুলিত হইয়া উঠে। ছন্দেরও যেমন নির্দিষ্ট সংখ্যা নাই, তালও তেমনি অসংখ্য।

> ন রাগানাং ন তালানাং ন বাদ্যানাং বিশেষতঃ
> নাপি প্রবন্ধগীতানামন্তো জগতি বিদ্যতে॥

সুতরাং ছন্দের বৈচিত্র্য অনুসারে তালের বৈচিত্র্য কল্পিত হইয়াছে। ভারতীয় সংগীত এই তালের দিকে যেরূপ মনোযোগ দিয়াছেন, অন্য কোথায়ও তাহার দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। সংগীতের উৎকর্ষ যেমন যেমন বাড়িয়াছে, তালেরও তেমনি সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম বিভাগ পরিকল্পিত হইয়া এক বিরাট সৌধ নির্মিত হইয়াছে। বৈঠকী গানের সঙ্গে মৃদঙ্গে বা তবলা-বাঁয়ায় যাঁহারা সংগত করিতে অভিলাষী তাঁহারা জানেন যে, অগণিত তালের বোল তাঁহাদিগকে যত্নে অভ্যাস করিতে হয়। সংগীতরত্নাকরের সময় (ত্রয়োদশ শতাব্দী) বা তাহারও পূর্ব হইতে সংগীতশাস্ত্রে এইসকল বাদ্যের বোল গ্রথিত হইয়া সংগীতশাস্ত্রকারেরও প্রতিপাদ্য হইয়াছে।

কীর্তনে তালের সংখ্যা ১০৮ প্রকার কথিত হয়। ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত তালগুলি সমধিক সুপরিচিত: একতালী, দশকুশী, সমতাল, পাকছুটা, শ্রুতি, পোট, ধরন, গঞ্জল, রূপক, বিষমপঞ্চ, পঞ্চমশোয়ারি, ছুটা, তেওট, তেওরা, তিউটি, ধড়া, ডাশপাহিড়া, জপতাল, যৎ, ঝাঁপতাল, ঠুঠুকী,

বীরবিক্রম, আড়তাল, নন্দন, চঞ্চুপুট, মঠক, ধামালি, ব্রহ্মতাল, রুদ্রতাল, ঝুজঝুটি, শশিশেখর, চন্দ্রশেখর, নটশেখর, লোফা—ইত্যাদি।

এই সকল তাল আবার ছোট, মধ্যম, ও বড় ভেদে নানাপ্রকার হয়, যথা—বড় দশকুশী, মধ্যম দশকুশী, ছোট দশকুশী, ইত্যাদি। দ্রুত ও বিলম্বিত ভেদই এই প্রকারভেদের হেতু। মাত্রারও তারতম্য লক্ষণীয়। বড় দশকুশী গুরু ও লঘু ধরিয়া ৫৬ মাত্রা (২৮+২৮), মধ্যম দশকুশী (১৪+১৪) ২৮ মাত্রা; ছোট দশকুশী ১৪ মাত্রা, তেওট ১৪ মাত্রা, জপতাল ১২ মাত্রা, একতালা ১২, ঝাঁপতাল ১০, লোফা ৮, যৎ ৭ মাত্রায় নিষ্পন্ন হয়।

কীর্তনগানে বিশেষতঃ উচ্চাঙ্গের কীর্তনে অনেক সময়ে বিলম্বিত লয়ের ব্যবহার হয়। ইহার কারণ আর কিছুই নহে—শ্রোতাকে ভাবিবার সময় দেওয়া। অর্থাৎ গায়ক যে চিত্রটি অঙ্কিত করিতেছেন, শ্রোতাকেও আপনার চিত্তে সেই চিত্রের উদ্দীপনায় অবসর প্রদান করা। অনেক বড় বড় ওস্তাদও কীর্তনের এই বিলম্বিত লয়ের বিন্যাস দেখিয়া চমৎকৃত হন।

এই সকল তাল ও দ্রুত, মধ্যম, বিলম্বিত লয়ের বাদ্য অভ্যাস করিতে অনেক সময় ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন হয়। বর্তমানকালে উপযুক্ত উৎসাহের অভাবে এইরূপ গান ও বাদ্যের অভাব ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়াছে। পূর্বে যে-সময়ে কীর্তনের প্রসার ও উন্নতি ছিল সে সময়ে গরানহাটী, মনোহরসাহী রেনেটি ও মন্দারিণী এই চারি ঘরের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বাদ্যে অভিজ্ঞ অনেক ব্যক্তি ছিলেন। এখনও কীর্তনবিদেরা তাঁহাদের নাম জানেন। ভারত দাস, ময়নাডালের নিকুঞ্জ মিত্র, বৃন্দাবনধামের গৌরদাস প্রভৃতি খোলবাদ্যে প্রভূত যশঃ লাভ করিয়াছিলেন।

কীর্তনে গায়কের ন্যায় বাদকেরও অনুভূতি প্রবল হওয়া আবশ্যক। ভাবের সহিত গান না হইলে যেমন রসসঞ্চারে বাধা হয়, তেমনি ভাবের সহিত বাদ্য না হইলেও রসপুষ্টিতে বাধা হয়। বর্তমানকালে শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ ব্রজবাসী প্রভৃতির ন্যায় প্রসিদ্ধ খোলবাদকের বাদ্য শুনিলেই ইহা বুঝিতে পারা যায়।

মনে করুন, গায়ক ভাবকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য আখর ধরিয়াছেন, এই আখর যেমন স্তরে স্তরে বিস্তৃত হইবে, বাদ্যও তেমনি স্তরে স্তরে বিস্তৃত হইয়া গীতের পারিপাট্য বিধান করিবে। বাজনার এই ভঙ্গীকে বলে 'কাটান'। আখরকেও কাটান বলা হয়। সুতরাং গায়ক ও বাদকের পূর্ণ সহযোগিতা না থাকিলে গান সফল হয় না। গায়ক পদ ও সুরের দ্বারা যেরূপ রসমাধুরী সৃষ্টি করিতে চাহেন, বা কাটানের উপর কাটান দিয়া যে অনুভূতি জাগ্রত করিতে চেষ্টা করেন, বাদক যদি তাহা অনুভব করিয়া বাদ্যের তরঙ্গে সেই সেই ভাব বিস্তার করিতে সহায়তা করেন, তবে সে গীত অপূর্ব হয়। ইহাই কীর্তনের 'টেক্‌নিক্'।

কীর্তনের টেক্‌নিক্ এক সময়ে এরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিল যে, কীর্তনকে পল্লীসংগীত বা folk musicএর অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। অনেকে এই টেক্‌নিক্ অবগত নহেন বলিয়া কীর্তনের প্রতি সুবিচার করিতে পারেন না। একদিক দিয়া গানে সুরের যে টেক্‌নিক্ গড়িয়া উঠিয়াছিল, অন্য দিকে বাদ্যেও তাহা প্রতিফলিত হইয়া কীর্তনের উন্নতির যুগকে সংগীতের ইতিহাসে এক স্মরণীয় যুগ করিয়া তুলিয়াছিল।

বর্তমান কালে যাঁহারা বৈঠকী গানের টেক্‌নিক্ আয়ত্ত করিয়াছেন, তাঁহারা কীর্তনের টেক্‌নিক্‌কে দুর্বোধ্য বলিয়া উপেক্ষা করেন। তাঁহারা সুর-সম্বন্ধে বৈচিত্র্য দেখিয়া মনে করেন, কীর্তনে সুরের অবনতি ঘটিয়াছে, তেমনি তাল-সম্বন্ধে মাত্রা গণিয়া হতাশ হইয়া ভাবেন যে কীর্তনে বিশুদ্ধ তাল নাই। বস্তুতঃ সূক্ষ্ম মাত্রাবিভাগের উপরই কীর্তনের তাল প্রতিষ্ঠিত। কীর্তনের সুর ও তাল সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে উভয়ই আয়াস স্বীকার করিয়া অভ্যাস করিতে হয়।

আবার যদি কখনও বাঙালী কীর্তন-গানের মর্যাদা উপলব্ধি করে এবং সুরজ্ঞ গায়কেরা ইহার টেক্‌নিক্ অভ্যাস করিবার কষ্ট স্বীকার করিতে উদ্যম করেন, তবেই কীর্তনের উন্নতি হইতে পারে।

উপসংহার

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে ভারতবর্ষের নানাস্থানে রাধাকৃষ্ণলীলা প্রচারিত হয় এবং ঐ লীলা অবলম্বনে বহু পদাবলী রচিত হইয়াছিল। বাংলা দেশে প্রচলিত পদাবলীর সহিত ঐ সকল পদাবলীর ভাব, কবিত্ব ও মাধুর্য তুলনা করিলে বাংলার কীর্তনের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিবার পক্ষে সুবিধা হইবে। কিন্তু সারাভারতের এই অতুলনীয় সম্পদ্ এখনও সম্যক্‌রূপে আলোচিত ও আস্বাদিত হয় নাই। মিথিলায় বিদ্যাপতি যে পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, বাংলার বৈষ্ণবসমাজ আনন্দের সহিত তাহা তাঁহাদের কীর্তনের সঙ্গে গাঁথিয়া লইয়াছিলেন,। বিদ্যাপতিকে আমরা বাঙালী বলিয়াই মনে করিয়া আসিয়াছি এবং কীর্তনে তাঁহাকে উচ্চাসন দিয়াছি। উত্তর পশ্চিমের হিন্দী কবি সূরদাসের পদাবলীও কিছু কিছু আমরা আত্মসাৎ করিয়াছি। পদকল্পতরুতে ইহাঁর একটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। রাজপুতানার মূর্তিমতী ভক্তি-স্বরূপিণী মীরাবাইয়ের অপূর্ব পদাবলী বাংলার মহাজনী কীর্তনের অঙ্গীভূত হইতে পারে নাই বটে, কিন্তু মীরার সংগীত কীর্তনেরই ছন্দে বাংলার অনেকস্থলে গীত হইতে শুনা যায়। শিখদের গ্রন্থসাহেবে যে পদাবলী আছে, তাহাও অনেকটা কীর্তনের ভঙ্গীতে লেখা। নানক জির এই সকল ভজন শিখদের সংগতে একান্ত নিষ্ঠার সহিত গীত হইয়া থাকে। এই সকল পদাবলীও গীতের উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় এবং ইহার মধ্যে যে ভক্তিভাবের নির্মলধারা প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা বঙ্গদেশের পদাবলী অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। উত্তর পশ্চিম ভারতেও সে সময়ে অর্থাৎ পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীতে এইরূপ এক ভাবের বন্যা বহিয়া গিয়াছিল। বল্লভাচার্য ও তাঁহার ভক্তদের মধ্যে কবিত্বের যে উচ্ছ্বাস দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বঙ্গদেশের কীর্তন-সম্পদের

সহিত তুলনীয়। তুলসীদাস, নন্দদাস প্রভৃতি কবিগণ ভক্তিধর্মের যে প্রবাহ ছুটাইয়াছিলেন তাহাও অত্যন্ত উপভোগ্য। তুলসীদাস তাঁহার রামায়ণে যে দোহা, চৌপাই প্রভৃতি দিয়াছেন; ভারতের বহু স্থানে তাহা গীত হইয়া থাকে। সুরদাস, নন্দদাস প্রভৃতি রাধাকৃষ্ণের লীলা সম্বন্ধে বহু পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ভাবের গাম্ভীর্যে ও ভাষার মাধুর্যে এখনও তাহা পরম আস্বাদ্য। উত্তরপশ্চিম ভারতে কয়েকজন মুসলমান কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা রাধাকৃষ্ণ লীলা সম্বন্ধে পদ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে রসখান্ ও খান্‌খানান্ আবদর রহিম খানের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রসখান ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত পাঠান। তিনি হিন্দীতে যে পদাবলী রচনা করিয়াছেন, তাহার কবিত্বমাধুর্য অবর্ণনীয়। আবদর রহিম ছিলেন বৈরাম খানের ভ্রাতা। ইনি আকবরের সেনাপতিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। কিন্তু রাধাকৃষ্ণলীলা-বর্ণনায় তিনি তাঁহার ভক্তিপ্রবণতার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা চিরদিন রসিকসমাজে আদৃত হইবে। দক্ষিণ ভারতে আলবারদের সংগীতও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তামিল ভাষায় ইহাদের পদাবলী 'তামিলবেদ' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

সুতরাং পদাবলীর দিক দিয়া দেখিলে এই ভাবধারা শুধু বাংলার নয় সমগ্র ভারতের সাংস্কৃতিক সম্পদ্। ভারতবর্ষকে জানিতে হইলে এই ভাবধারার সহিত বিশেষ পরিচয় থাকা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়। ইহার মধ্যে আবার বাংলার উচ্চাঙ্গের কীর্তন সুর তাল ও ব্যঞ্জনায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

। ১৩৫০ ।

১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. কুটিরশিল্প : শ্রীরাজশেখর বসু
৩. ভারতের সংস্কৃতি : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪. বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৬. মায়াবাদ : মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ
৭. ভারতের খনিজ : শ্রীরাজশেখর বসু
৮. বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৯. হিন্দু রসায়নী বিদ্যা : আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১০. নক্ষত্র-পরিচয় : অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
১১. শারীরবৃত্ত : ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
১২. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
১৩. বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ : অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
১৪. আয়ুর্ব্বেদ-পরিচয় : মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন
১৫ বঙ্গীয় নাট্যশালা : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬. রঞ্জন-দ্রব্য : ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী
১৭, জমি ও চাষ : ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী
১৮. যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি-শিল্প : ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা

। ১৩৫১ ।

১৯. রায়তের কথা : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
২০. জমির মালিক : শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১. বাংলার চাষী : শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু
২২. বাংলার রায়ত ও জমিদার : ডক্টর শচীন সেন
২৩. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ বসু
২৪. দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
২৫. বেদান্ত-দর্শন : ডক্টর রমা চৌধুরী
২৬. যোগ-পরিচয় : ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার
২৭. রসায়নের ব্যবহার : ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহ সরকার
২৮. রমনের আবিষ্কার : ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত
২৯. ভারতের বনজ : শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
৩০. ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস : রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১. ধনবিজ্ঞান : অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত
৩২. শিল্পকথা : শ্রীনন্দলাল বসু
৩৩. বাংলা সাময়িক সাহিত্য : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪. মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ : শ্রীরজনীকান্ত গুহ
৩৫. বেতার : ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর
৩৬. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য : শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ